POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 ই জুন, 2023 25 যুল কাদা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

বিনম্রভাবে ঋণ ফেরত চাওয়া উচিত।

২৩৯১) হযরত হুযাইফা (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন- এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি কাজ করত। সে উত্তর দেয়- আমি ব্যবসা করতাম। (ঋণ ফেরত নেওয়ার সময়) ধনীদেরকে সময় দিতাম আর অভাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতাম। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

হযরত আবু মাসউদ (রা.) বলেন- আমিও এই এটি (হাদিসটি) নবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি।

ভাল মানুষেরা ভালভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

২৩৯২) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে উট ফেরত চাইল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তাকে দিয়ে দাও। সাহাবারা বললেন, আমরা এর (এই উটের) চেয়ে বয়স্ক উট পেয়ে থাকি। সেই ব্যক্তি বলল, আপনি আমাকে মুক্তহস্তে দান করুন। আল্লাহ্ তা'লাও আপনাকে মুক্ত হস্তে দান করবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: তাকে (সেই উটটিই) দিয়ে দাও। কেননা, তারাই উত্তম যারা ভালভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরাজ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২১ শে এপ্রিল,২০২২ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,
প্রশ্নোত্তর

মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে আমি নিতান্তই ঘৃণার চোখে দেখি আল্লাহ্ ত'লা কোথাও মৃতদের কাছে যাওয়ার নির্দেশনা দেন নি। বরং كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আদেশ প্রদানের মাধ্যমে জীবিতদের সহচার্যে থাকার আদেশ করেছেন। আমি সত্য সত্য বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ঈমান সম্পন্ন মানুষের সহচার্যে না থাকে ততক্ষণ ঈমান সঠিক হয় না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আসল কথা হল মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে আমি নিতান্তই ঘৃণার চোখে দেখি। মৃতদের দিকে ফিরে যাওয়া এবং জীবিত থেকে দূরে সরে যাওয়া দুর্বল ঈমান সম্পন্ন মানুষদের কাজ। খোদা তা'লা বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবদ্দশায় লোকে তাঁর নবুয়্যতকে অস্বীকার করতে থেকেছে আর যেদিন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তারা বলল, আজ নবুয়্যতের অবসান ঘটল। আল্লাহ্ ত'লা কোথাও মৃতদের কাছে যাওয়ার নির্দেশনা দেন নি। বরং كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আদেশ প্রদানের মাধ্যমে জীবিতদের সহচার্যে থাকার আদেশ করেছেন। এই কারণেই আমি বন্ধুদের বার বার এখানে এসে থাকার উপর জোর দিই। আর আমি যখন কোন বন্ধুকে এখানে থাকতে বলি, তখন আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, নিতান্ত তার উপর দয়াপরবশ হয়ে সহানুভুতি ও হিতকামনায় এমনটি বলে থাকি।

আমি সত্য সত্য বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ঈমান সম্পন্ন মানুষের সহচার্যে না থাকে ততক্ষণ ঈমান সঠিক হয় না। আর এটা এজন্য যে মানুষের স্বভাব পরিবর্তনশীল। একই সময়ে সকলের প্রকৃতি অনুসারে বক্তার মুখ থেকে ভাষণ বের হয় না। এমন সময় আসে যখন তার বোধগম্যতা , চিন্তাধারা ও প্রকৃতি অনুসারে আলোচনা হয় আর তা উপযোগীও হয়। আর মানুষ যদি বার বার না আসে আর বেশি দিন পর্যন্ত না থাকে, তখন এমনও হতে পারে যে, এক সময় এমন বক্তৃতা হচ্ছে (যখন সে এখানে উপস্থিত রয়েছে) যা তার প্রকৃতি সম্মত নয় যা তাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং তাকে ইতিবাচক চিন্তাধারা থেকে দূরে সরিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে।

বস্তুত কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবিতদের সহচার্যে থাকাই এর অভিপ্রায়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬২)

এই আয়াতে ইসলামী ব্যবস্থাপনার আরও একটি এমন আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে অনন্য। এতীমদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার আদেশ প্রত্যেক ধর্মে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সম্পদ রক্ষা কর, সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর- এমন আদেশ অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায়

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাইলের ৩২ নং আয়াত

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا
بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এতীমদের সম্পদের ধারেকাছেও যেও না। اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে কারো সম্পদ ব্যয় করা যায় যা যাতে সর্বোত্তম পরিণাম তৈরী করা যায়। অর্থাৎ শুধু তাদের সম্পদকে অবৈধভাবে খরচ করা নয়, বরং সেটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে সেটি বৃদ্ধি পায় এবং এতীমদের লাভ হয়। এই আয়াতে ইসলামী ব্যবস্থাপনার আরও একটি এমন আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে অনন্য। এতীমদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার আদেশ প্রত্যেক ধর্মে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সম্পদ রক্ষা কর, সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর- এমন আদেশ অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এই আয়াতে একটি সার্বজনীন আদেশ জারি করার আদলত নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নাবালকদের সম্পত্তি রক্ষক বিভাগ। বর্তমানে পশ্চিমাদেশগুলির অধীনে এই আদেশ অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে ১৩শ বছর পূর্বে ইসলামই এই চিন্তাধারা ভিত রচনা করে।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। আপাতদৃষ্টিতে এই বাক্যাংশটি এতীমদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, এতীমদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটি নয়। কেননা, ১) 'আহদ' বা প্রতিশ্রুতি দায়িত্বও পালনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমনটি ব লা হয়- فُلَانٌ وَلِيُّ الْعَهْدِ অর্থাৎ সরকার দায়িত্বের অভিভাবক হয়ে থাকে। এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাক্যের অর্থ হবে এতীমদের সম্পর্কিত নিজের দায়িত্ব পালন কর। যতদিন পর্যন্ত তাদের সম্পদের দেখাশোনার প্রয়োজন রয়েছে, তার ব্যবস্থা কর। আর যখন তাদের সম্পদ সঁপে দেওয়ার সময় আসে তখন তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দাও। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতীমদের সম্পদ রক্ষা করা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা নয়, বরং এটি খোদা তা'লার আদেশ এবং ইসলামী ব্যবস্থাপনার অংশ বিশেষ। তাই এটিকে তোমরা এই কাজটি অনগ্রহ হিসেবে করবে না, বরং কর্তব্য হিসেবে করবে। ২) যেহেতু এতীম তার সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু জানার সুযোগ পাবে না ,তাই খোদা তা'লা

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

একথা মাথায় রাখবেন যে, আপনি একজন আহমদী ছেলে, আপনি ঈমান রাখেন যে, খোদা এক এবং ইসলাম সত্য ধর্ম। আর আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীম শেষ শরিয়ত গ্রন্থ যা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বেশ! আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে একাধিক আদেশ প্রদান করেছেন। তাই ভাল কি আর মন্দ কি তা যদি আপনার জানা থাকে আর আপনি যদি চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষ হন আর আপনার মাঝে বোধবুদ্ধি থাকে তবে সেই সব মন্দ বিষয়াদি থেকে আপনাকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত যা আপনার ইহকাল ও পরকাল উভয়কে ধ্বংস করে দিতে পারে। একথা মনে করবেন না যে আপনি কোন অনুচিত কাজ করলে আপনাকে কেউ দেখছে না। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতি মুহূর্তে আপনাকে দেখভেন আর আমরা যা কিছু করি সে সম্পর্কে তিনি জানেন।

চেষ্টা করবেন এমন সব ছাত্রদের মধ্য থেকে বন্ধু নির্বাচন করার যাদের স্বভাব চরিত্র ভাল, পড়ালেখায় ভাল এবং নৈতিকভাবে উন্নত।

একজন ওয়াকফে নও-এর উচিত সব সময় উন্নত চরিত্র প্রদর্শন কর, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও সহনাভুতিপূর্ণ আচরণ করা। ওয়াকফে নও শিশুদের একে অপরের বিরুদ্ধে ঝগড়া করা উচিত নয়। তাদের ভাল টিভি অনুষ্ঠান দেখা উচিত, খারাপ অনুষ্ঠান দেখা উচিত নয়। আর নিজেদের পড়াশোনার বিষয়ে ভাল তৎপরতা দেখানো এবং খুব পরিশ্রম করা উচিত যাতে ভাল গ্রেড অর্জন করেন। এগুলিও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ যা ওয়াকফে নওদের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও আমার খুতবা আপনাদের শোনা উচিত।

কানাডার ওয়াকফে নও আতফালদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনলাইন সাক্ষাত

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১৭ই অক্টোবর ২০২১ তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কানাডার ওয়াকফে নওদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়অর ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) -এর এ.টি.এ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অপরদিকে ৫৫০ জন ওয়াকফে নও ও আতফাল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার Mississauga (ওন্টারিও) থেকে অন লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের যোগদান করেন।কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ওয়াকফে নও আতফালরা হুযুর আনোয়ারের কাছে নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, হাইস্কুলের একজন নতুন ছাত্র হিসেবে আমি স্কুলে অনেক কিছু খারাপ জিনিস দেখেছি। স্কুলের এই সব মন্দ বিষয় থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনার বয়স এখন প্রায় ১৫ বছর আর এই বয়সটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা ১৫-১৬ বয়সে উপনীত হয়ে কিশোরদের মনে এই ধারণা জন্ম নেয় যে তারা সাবালক হয়ে গেছে আর এখন তাদের উপর কোন বিধিনিষেধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একথা মাথায় রাখবেন যে, আপনি একজন আহমদী ছেলে, আপনি ঈমান রাখেন যে, খোদা এক এবং ইসলাম সত্য ধর্ম। আর আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীম শেষ শরিয়ত গ্রন্থ যা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বেশ! আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে একাধিক আদেশ প্রদান করেছেন। তাই ভাল কি আর মন্দ কি তা যদি আপনার জানা থাকে আর আপনি যদি চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষ হন আর আপনার মাঝে বোধবুদ্ধি থাকে তবে সেই সব মন্দ বিষয়াদি থেকে আপনাকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত যা আপনার ইহকাল ও পরকাল উভয়কে ধ্বংস করে দিতে পারে। একথা মনে করবেন না যে আপনি কোন অনুচিত কাজ করলে আপনাকে কেউ দেখছে না। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতি মুহূর্তে আপনাকে দেখবেন আর আমরা যা কিছু করি সে সম্পর্কে তিনি জানেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের জন্য এবং ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকার থাকার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী অনুসারেও সৎ কর্ম করতে হবে। অনুরূপভাবে আপনি এই সমাজ এবং আপনার সহপাঠীদের বদঅভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে আপনি যদি জানেন যে আপনার সহপাঠীদের মধ্যে কেউ অনুচিত কোনও কাজ করছে তবে সেই কাজের প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা উচিত বা সেটি ঘৃণা করা উচিত। আর তারা যদি কোন অনুচিত কাজ করে থাকে তবে তারা যেন একথা জানতে পারে যে আপনার এই কাজ অপছন্দ। যখন তারা জানতে পারবে যে, এই সব মন্দ কাজ আপনার পছন্দ নয়, তখন তারা আপনার সামনে এই সব কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। এটিও একটি পন্থা যার মাধ্যমে আপনি (অসামাজিক) কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে পারেন। চেষ্টা করবেন এমন সব ছাত্রদের মধ্য থেকে বন্ধু নির্বাচন করার যাদের স্বভাব চরিত্র ভাল, পড়ালেখায় ভাল এবং নৈতিকভাবে উন্নত।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার জন্য সব থেকে ভাল উপায় কোনটি, যাতে হুযুর আমাকে চিনতে পারেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, (আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া উচিত যে) আপনি কে? আপনার উচিত আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখা। মাঝে মধ্যে কোন ভাল কৌতুক লিখে পাঠাবেন বা ভাল কোন রচনা। এভাবে আমার মনে থাকবে যে আপনি সেই ব্যক্তি যে আমাকে একথা লিখেছিল। আপনার ইচ্ছে হলে নিজের ছবিও পাঠাবেন।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, এম.টি.এর এমন কোন চ্যানেল হতে পারে যা কেবল শিশুদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে আর যে চ্যানেল আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগের ঘটনাবলী শোনানো হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে আর টাইম স্টোরিও রয়েছে। এখন তারা একটি নতুন অনুষ্ঠান শুরু করেছে যাতে শিশুদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় আমার খুতবার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয় আর বিভিন্ন আঙ্গিকেও উপস্থাপন করা হয়। তাই শিশুদের জন্য আমাদের কাছে যথারীতি অনুষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু এমন সময় আসবে যখন আমাদেরকে শিশুদের জন এম.টি.এর একটি পৃথক চ্যানেল তৈরী করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। পরে দেখা যাবে। আপনি কি Children slot দেখেন। Story time এবং শিশুদের অন্যান্য অনুষ্ঠান ও বাচ্চাদের জন্য খুতবার যে সারাংশ উপস্থাপন করা হয় সেগুলো দেখেন? এগুলোও অনেক ভাল অনুষ্ঠান, যা আপনাদের দেখা উচিত।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, একজন আদর্শ ওয়াকফে নও হওয়ার জন্য আমাদের কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন আদর্শ ওয়াকফে নও- এর জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। এক রুকু প্রত্যহ তিলাওয়াত করা উচিত আর সম্ভব হলে কুরআন করীমের মূল টেক্ট বোঝার চেষ্টা করা উচিত বা তিলাওয়াত কৃত অংশের অনুবাদ পড়া উচিত। একজন ওয়াকফে নও-এর উচিত সব সময় উন্নত চরিত্র প্রদর্শন কর, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও সহনাভুতিপূর্ণ আচরণ করা। ওয়াকফে নও শিশুদের একে অপরের বিরুদ্ধে ঝগড়া করা উচিত নয়। তাদের ভাল টিভি অনুষ্ঠান দেখা উচিত, খারাপ অনুষ্ঠান দেখা উচিত নয়। আর নিজেদের পড়াশোনার বিষয়ে ভাল তৎপরতা দেখানো এবং খুব পরিশ্রম করা উচিত যাতে ভাল গ্রেড অর্জন করেন। এগুলিও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ যা ওয়াকফে নওদের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও আমার খুতবা আপনাদের শোনা উচিত।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, সে তার হৃদয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর ন্যায় পুণ্য কিভাবে সৃষ্টি করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, অপরের জন্যও একই সহানুভুতি ও ভাবাবেগ পোষণ করুন যা আপনার ভাই-বোনের জন্য রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) যে সমস্ত কাজ কর্ম করতেন তা আল্লাহ্ তা'লার জন্য করতেন। তাঁর হৃদয়ে খোদার প্রতি ভালবাসা তরঙ্গায়িত হত। তাই হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন। আর হৃদয়ে যখন এই ভালবাসা তৈরী হবে তখন আপনার মধ্যে খোদার সৃষ্টির প্রতিও ভালবাসা তৈরী হবে। আঁ হযরত (সা.) এর প্রতিও মনের মধ্যে ভালবাসা তৈরী করুন যিনি আমাদেরকে খোদাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। তাই আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী অধ্যায়ন করতে হবে। এভাবে আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি আপনার মনে ভালবাসা তৈরী হবে। এর পরিণামে মানবজাতি ও আপনার সঙ্গী সাথীদের প্রতিও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

জুমআর খুতবা

আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি। (মসীহ মওউদ)

আম্বিয়াগণের জামাতের কাজ হল ধৈর্য ধারণ করা এবং আইন মেনে চলা।

এই ধৈর্য ই তো বিশ্বব্যাপী জামা'তকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, যিনি শান্তি বজায় রাখার এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা ধৈর্য প্রদর্শন করবে।

নবীদের এবং তাঁদের জামা'তের সুন্নত বা রীতি হলো, তারা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ এবং রসূল (সা.)-এরও নির্দেশ রয়েছে। হযরত মসীহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে জামা'তকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন, দোয়াকরার উপদেশ দিয়েছেন আর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাদের পা দুর্বল এবং আমার সাথে এসব কণ্টকাকীর্ণও পাথুরে পথে চলতে পারে না আর ধৈর্যধারণের শক্তি রাখে না, তারা চাইলে আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে।

মওউদ (আ.)-ও আমাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন।

সব সময় একথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, ধৈর্য যেন কোন অপারগতার কারণে না হয়, কোনও জাগতিক ভীতির কারণে না হয়, বরং কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া উচিত। এমনটি হলে তবেই সেটিকে প্রকৃত ধৈর্য বলা যাবে যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে।

একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, জামাতের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ধৈর্যসহকারে ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ দুঃখ কষ্টকে সহন করতে হবে।

আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি, ধৈর্য হারিয়ো না। ধৈর্য এমন এক অস্ত্র যে, যে-কাজ কামান দ্বারা অর্জিত হয় তা ধৈর্যের দ্বারা অর্জিত হয়। ধৈর্যই মানুষের মন জয় করে।"

[হযরত মসীহমওউদ (আ.)]

যখন আমরা স্বয়ং নিজেদের জীবনকে তাকওয়ার পথে পরিচালনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করব তখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবো যার ফলে পুণ্যের অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে।

"হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বনী ইসরাঈল তাকে (তার দাবি করার) সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিয়েছিল। এজন্য জাতির পক্ষ তাকে কোনো দুঃখকষ্ট বা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৮ শে এপ্রিল, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (২৮ শাহাদত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,কেউ কেউ আমাকে লিখেন এবং নিজের কথার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেওয়ারও চেষ্টা করেন যে, পাকিস্তানে অথবা অন্যান্য স্থানে জামা'তের যে অবস্থা বিরাজমান তাতে আমাদের শুধুমাত্র ধৈর্যধারণের পরিবর্তে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত, ধৈর্য অনেক দেখানো হয়েছে। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, তাঁর যুগে জামা'ত এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, আর তিনি কোনো কোনো স্থানে জামা'তকে প্রতিক্রিয়া দেখানোর অনুমতি দিয়েছেন। এগুলো একেবারে ভুল কথা যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়। এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই ভুল বোঝা হয়েছে। কিছু ঘটনা হয়ত সামনে এসেছে, কেউ হয়ত পড়ে থাকবে কিন্তু ভুল বুঝেছে। অবশ্য তিনি আইনের গণ্ডিতে থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এমন নয় যে, চিন্তা-ভাবনা না করেই (তিনি) নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদের মিছিলের ন্যায় মিছিল বের করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া কোথাও যদি কোনো প্রকার প্রতিবাদ করা হয়ে থাকে তা যুগ খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছিল। এমন নয় যে, প্রত্যেক কর্মকর্তা ইচ্ছামতো নিজের লোকদের জড়ো করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা শুরু করে দেবে। যাহোক, দেশবিভাগের পূর্বে, যখন ভারতে ইংরেজদের শাসন ছিল,কতিপয় ইংরেজ কর্ম কর্তা এবং আমাদের বিরোধী কর্মকর্তারা বহুবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বক্তৃতাসমূহকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য আখ্যায়িত করার অথবা এমন রূপ দান করার চেষ্টা করেছে, যার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার তারা এজন্য ব্যর্থ হতো কেননা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিরুদ্ধবাদী এবং সরকারী কর্মকর্তাদেরকে তাদের স্ব রূপ দেখিয়ে শেষের দিকে সর্বদা জামা'তকে বলতেন, নবীদের জামা'তের কাজ হলো ধৈর্যধারণ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। আর এ কথা তৎকালীন কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছে যে, বক্তৃতা চলাকালীন যখন আমরা মনে করতাম যে, আজ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আসবে, বিদ্রোহ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার ধারা আরোপ করে আমরা গ্রেফতার করার চেষ্টা করব, কিন্তু যখন বক্তৃতা শেষ হতো তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে (তিনি) জামা'তকে উপদেশ দিতেন এবং সেসব কাজ করতে বারণ করতেন যেগুলো আইনের গণ্ডি বহির্ভূত ছিল। এভাবে সেসব বিরোধী কর্মকর্তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেত। আর তিনি (রা.) এমন কোনো কথা বলবেন যা ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার বিরোধী হবে– তা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে জামা'তকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন, দোয়া করার উপদেশ দিয়েছেন আর স্পষ্ট করে দিয়েছেন

যে, যাদের পা দুর্বল এবং আমার সাথে এসব কণ্টকাকীর্ণও পাথুরে পথে চলতে পারে না আর ধৈর্যধারণের শক্তি রাখে না, তারা চাইলে আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে। (আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩-২৪)

এই ধৈর্য ই তো বিশ্বব্যাপী জামা'তকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

অনেক রাজনীতিবিদ এবং সংবাদ মাধ্যম আমাকেও জিজ্ঞেস করে আর অধিকাংশ সময়ে আমি তাদের এই উত্তরই দিই যে, যারা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের মধ্য থেকেই আমরা আহমদীরা এসেছি এবং এসব নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তাদের মাঝ থেকেই লোকেরা (আহমদীয়াতে) আসছে। আমাদের স্বভাব প্রকৃতিও তাদের মতোই ছিল। আমরাও তাদের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি, কিন্তু আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, যিনি শান্তি বজায় রাখার এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা ধৈর্য প্রদর্শন করবে।

তবে, আইনের গণ্ডিতে থেকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য যতটুকু চেষ্টা করার তা করতে পারো। কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বিষয় আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দেওয়ারও উপদেশ দিয়েছেন আর বলেছেন, খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এবং তিনি এসেছেন। অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এটি নবীদের ইতিহাস আর এটিই আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা যে, আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। যাহোক, এই উত্তরে মানুষ হতবাকও হয় আর সাধুবাদও জানায় যে, এটিই শান্তি প্রিয় লোকদের যথার্থ প্রতিক্রিয়া।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে যারা কথা বলে তাদের জন্য তাঁরই খুতবার আলোকে আরও স্পষ্ট করে কিছু কথা বর্ণ না করতে চাই। আলোচ্য খুতবায় তিনি (রা.) অত্যন্ত বিশদভাবে ধৈর্যের অর্থ বর্ণনা করেছেন, আলোকপাত করেছেন, বরং এরপর ধারাবাহিকভাবে উন্নত নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত খুতবা দিতে আরম্ভ করেন আর ধৈর্যের বিষয়বস্তুর সাথে একে সম্পৃক্ত করেছেন। যাহোক, আলোচ্য খুতবাকে কাজে লাগিয়ে, কিছু কথা বলব। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ধৈর্য সম্পর্কিত যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেসব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ধৈর্যকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখ্যায়িত করে বলেন, এটি নবীদের জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম, যা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না আর জগৎকে নিজের পিছনে চলতে বাধ্য করতে পারেনা। আর এমন কোনো জামা'ত বা দল অতিবাহিত হয়নি, যারা এই কর্তব্য পালন না করেই সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছে।

ধৈর্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। তিনি (রা.) এটি স্পষ্টও করেছেন, তিনি তাঁর তফসীরে কোনো কোনো আয়াতের তফসীরেও এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এক প্রকার ধৈর্য হলো, মানুষের কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ধৈর্যধারণ করে। আর দ্বিতীয়ত, সেই সময়ের ধৈর্য যখন তার মোকাবিলা করার বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো শক্তিই থাকে না, সেই ধৈর্য (মূলত) অপারগতার ধৈর্য।

শক্তি বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যের অর্থ হলো, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকারীদের বা অত্যাচারীদের প্রত্যুত্তর না দেওয়া। বিরোধীরা যেভাবে আচরণ করছে (ঠিক) সেভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখানো এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে চূড়ান্ত ধৈর্য প্রদর্শন করা। আর (প্রতিরোধের) সামর্থ্য না থাকার কারণে ধৈর্য ধারণের অর্থ হলো, দৈব দুর্বিপাক বা বিপদাপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারণ করা। যাহোক উর্দূতে ধৈর্য বলতে বুঝায় হা-হুতাশ না করে চুপ থাকা। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আমরা যখন আরবী অর্থ পর্যালোচনা করি তখন সঠিকভাবে বুঝতে পারি যে, ধৈর্যের প্রকৃত অর্থ বা মর্ম কী আর একজন মু'মিনের কীরূপ ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে ধৈর্যের যে উপদেশ দিয়েছেন আর তাঁর শিক্ষা দৃষ্টিপটে রেখে 'সব্‌র' শব্দের প্রকৃত অর্থ যা অভিধানে বর্ণি ত হয়েছে, সে অনুসারে 'সব্‌র' শব্দের তিনটি অর্থ আছে।

প্রথমত, পাপ পরিহার করা আর নিজেকে তা থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয়ত, অবিচলতার সাথে সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর তৃতীয় অর্থ হলো, হা-হুতাশ থেকে বিরত থাকা। সাধারণত উর্দূতে এসব অর্থই করা হয়।

অতএব, প্রথম অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে (ধৈর্য হলো), মানুষের নিয়মিত ও অবিচলতার সাথে সেসব পাপের মোকাবিলা করা, যা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে, এরপর সেসব পাপের মোকাবিলার জন্যও প্রস্তুত থাকা, যা ভবিষ্যতে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। সুতরাং ধৈর্য শুধু এতটুকুই নয় যে, (মৌখিকভাবে) বলা হবে , আমরা অনেক বড় ধৈর্যশীল আর এরপর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং অবিচলতার সাথে নিজের অভ্যন্তরীণ (দোষ-ত্রুটি) পরিষ্কার করাই হলো প্রকৃত ধৈর্য। যারা এমন মানুষ, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্যের জন্য এমন স্থান থেকে আসেন যার কল্পনাও করা যায় না।

বিরুদ্ধবাদীরা চায় আমরা যেন ধৈর্যের আঁচল হাতছাড়া করি এবং তাদের মতো আচরণ করি, যাতে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একথা বলেন যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে, আত্মবিশ্লেষণ করে দেখবে যে, তোমরা যা বলছো তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশসম্মত কি-না? আর সে মোতাবেক কাজ করতে হবে।

('সবর' এর) দ্বিতীয় অর্থের ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যেন অবিচলতার সাথে সেই পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যা সে অর্জন করেছে আর সেসব পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করা যা সে এখনও অর্জন করতে পারে নি। এটিও এক প্রকার ধৈর্য। এটিও প্রকৃত অর্থে একজন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে। আর জানা কথা যে, এই নৈকট্য বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়ার মাধ্যমে লাভ হতে পারে, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্ল াহ্ তা'লা এক জায়গায় বলেন, وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (সূরা আল্ বাকারা: ৪৬) অর্থাৎ আর ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর অবশ্যই বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এ বিষয়টি কঠিন। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে এবং যারা বিনয়ী তারাই এমন ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারে (এবং) যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে।

এরপর অন্যত্র বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

(সূরা আর্ রা'দ: ২৩) আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির খাতিরে ধৈর্যধারণ করেছে এবং সুন্দরভাবে নামায আদায় করেছে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও আমাদের পথে ব্যয় করেছে আর পুণ্যের মাধ্যমে পাপকে দূরীভূত করতে থাকে তাদেরই জন্য পারলৌকিক শুভ পরিণাম নির্ধারিত রয়েছে। এ পৃথিবী তো ক্ষণস্থায়ী, এখানে তো বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে (কিন্তু) পারলৌকিক গৃহ, যা সর্বশেষ বাসস্থান তা এমন লোকেরা লাভ করে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে।

অতএব, ধৈর্য হলো অবিচলতা, বিনয় এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনার নাম। আর এমনটি তখনই হবে যখন আমরা নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষানুযায়ী সাজাবো এবং নিজেদের জীবন সে অনুসারে অতিবাহিত করব। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই হবে আমাদের উদ্দেশ্য। আর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হা -হুতাশ না করাও ধৈর্যে র একটি অর্থ। বাহ্যিক বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি অথবা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি বা অন্য কোনো বিপদ আসলে, বিচলিত না হওয়া আর অভিযোগের সুরে হা-হুতাশ না করা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে এটি কী করলেন!- এগুলো অধৈর্যের লক্ষণ।

আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আচরণ। সর্বদা মনোভাব এটি হওয়া উচিত যে, যা কিছু আমার কাছে আছে তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ, আজ আল্লাহ্ তা'লা নিয়ে থাকলে কাল আরও দিবেন। অতএব এমন মানসিকতার অধিকারীরাই সত্যিকার মু'মি ন। আর এমন ধৈর্যশীলরাই আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রকৃত ধৈর্যধারণকারী।

অতএব এ হলো ধৈর্যের তিনটি অর্থ , কিন্তু সর্বদা এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো দুর্বলতার কারণে যেন ধৈর্যধারণ না করা হয়, জাগতিক কোনো ভয়ের কারণে যেন তা না হয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই যেন তা হয়, তবেই সেটি প্রকৃত ধৈর্য যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকৃষ্ট করে।

যদি কোনো ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে বা বাদশাহ্‌র সম্মুখে তার অত্যাচারের মুখে কেবলমাত্র এই কারণে নীরব থাকে যে, সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে ধৈর্যধারণ করছে তবে এটিই প্রকৃত ধৈর্য। আর তা যদি জীবননাশের ভয়ে হয়ে থাকে, তবে এটি সঠিক নয়।

আমরা যে ধৈর্যধারণের নসীহত করি তা কেবলমাত্র এ কারণে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ।

যদি প্রতিশোধই নিতে হয় তবে বহু আহমদী এই ক্ষোভ নিয়ে বসে থাকবে যে, জীবনের পরোয়া করি না, আমরা প্রতিশোধ নিয়ে একবার হলেও এই অত্যাচারীদের শায়েস্তা করতে পারি আর শায়েস্তা করে ছাড়ব। কিন্তু আমরা এমনটি করব না। এটি সেই শিক্ষার পরিপন্থি যা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর আমরা এমন কার্যকলাপকে ঘৃণা করি, কেননা এটি নবীদের জামা'তের জন্য শোভনীয় নয়। আর আমরা বয়আতের অঙ্গীকারে মানবজাতিকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখারও অঙ্গীকার করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে কঠোরভাবে এসকল বিষয়ে বারণ করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ধৈর্য ধারণের বিষয়ে একটি দিক এটিও বলেছেন যে, স্মরণ রেখো! তোমাদের আমলের মাধ্যমে ধৈর্য ও আত্মসম্মানহীনতার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে ঋণ করতে যায় আর সেই ব্যক্তি তাকে ভালোমন্দ কথা শুনায় আর বেহায়া ও নির্লজ্জ বলে চরম অপমান করে আর যাচনাকারী হাসি দিয়ে তার কথা এড়িয়ে যায় এবং ভাবে যে, এখন যেহেতু আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাই তার গালিগালাজও আমার হজম করে নিতে হবে, তবে এটি নির্লজ্জতা ও আত্মসম্মানহীনতা। কিন্তু অনেক সময় জাতীয়

ওধর্মীয় স্বার্থে ধৈর্যধারণ করতে হয় আর নীরবও থাকতে হয়। আর এই ধৈর্য ব্যক্তিগত স্বার্থে হয় না। এ কারণে এটিই প্রকৃত ধৈর্যধারণ আর তা আত্মসম্মানহীনতা নয়। উদাহরণস্বরুপ এমন কোনো ক্ষেত্রে, যেখানে তার প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে তার জাতির ওপর কোনো বিপদ আপতিত হতে পারে সেখানে যদি সে আক্রমণ করে আর ধৈর্যধারণ না করে তবে তাকে নির্বোধ বলা হবে, কেননা এভাবে সে নিজ জাতির ক্ষতি করে। কাজেই সে যখন নিজ জাতির কল্যাণার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না অথবা পৃথিবীকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ধৈর্যধারণ করে, তখন তার এই ধৈর্য প্রকৃত ধৈর্য আখ্যায়িত হয়।

অতএব এই বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কতক লোক খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, (আমাদের) অমুক লোককে পুলিশ আটক করেছে, তাই জনসভা করো আর মিছিল বের করো। এগুলো সবই ভুল কাজ। শত্রুরা চায় যেন আমরা এমন আচরণ করি, যাতে তারা সেসব কর্মকর্তার সাথে মিলিত হয়ে যারা পূর্বে ই আমাদের বিরোধী, আমাদের বিরুদ্ধে অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারে, সেসব আহমদীকে ধরতে পারে এবং আমাদের ব্যাবস্থাপনার ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপের ষড়যন্ত্র করতে পারে অথবা সরকারের কাছে এর দাবি করতে পারে, যেখানে কিনা সরকারও বা অধিকাংশ কর্ম কর্তাও আমাদের বিরোধী। এখন যখন কিনা সরকারের কতক কর্ম কর্তাও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর এমন পরিস্থিতিতে মুনাফেকরাও (যেখানে) সুযোগ নিয়ে থাকে, এমনসব উপলক্ষ্যে সেখানে যখন এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে তখন পরিস্থি তির অবনতি হয়েছে। আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি আর হবেও এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও এটি যে, এমন পরিস্থিতিতে যখন এমন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে তখন পরিস্থিতির অবনতিও হয়েছে। এমন কতিপয় ঘটনা জামা'তের ইতিহাসে রয়েছে যেখানে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। আর যখন ধৈর্যধারণ করে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আইনগত প্রচেষ্টা করা হয়েছে তখন সকল স্থানে শতভাগ না হলেও বহু স্থানে এতে লাভ হয়েছে।

এই কথা আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমরাও এই জাতিরই সদস্য, আর ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া আমাদের মাধ্যমেও প্রদর্শিত হতে পারে বা আমাদের মধ্য থেকে কারো দ্বারা প্রদর্শিত হতে পারে, কিন্তু আমরা এমনটি করি না।

এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি আর ধীরে ধীরে কতক কর্ম কর্তার হৃদয়ে এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে এবং পড়েছে আর এমনসব ঘটনার অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। আমরাও যদি গালমন্দের উত্তরে গালমন্দ করি ও মারধরের প্রত্যুত্তরে মারধর করি তাহলে যারা যেরে-তবলীগ রয়েছেন তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাবের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তখন তারা এই কথা বলার অধিকার রাখবে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে তাদের মাঝে কী এমন ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছেন যে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো? তাদের বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিরোধীদের প্রতি তেমনই।

নবীদের এবং তাঁদের জামা'তের সুন্নত বা রীতি হলো, তারা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ এবং রসূল (সা.)-এরও নির্দেশ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও আমাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন।

অতএব আমাদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জামা'তের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে সাময়িক ও ছোটোখাটো কষ্ট ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে, বরং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.) তো এক উপলক্ষ্যে এটিও বলেছেন যে, আমাদের কখনো কখনো আইনের আশ্রয় নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। ধৈর্য সহকারে কঠোরতা সহ্য করা উচিত।

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মানুষ বলতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাঁর পুস্তকসমূহে কতক কঠিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তাই আমরাও এমনটি করতে পারি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবীদের মর্যাদা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা জাগতিক বিষয়াদিতেও দেখি যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জজ যদি অপরাধীকে চোর আখ্যায়িত করে তবে সেটি হলো তার কর্মগণ্ডি এবং তার (এরূপ করার) অধিকার রয়েছে আর সেটির ভিত্তিতে সে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে ও তার সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এটি সবার কাজ নয় যে, অন্যদেরকে চোর কিংবা অপরাধী বলে বেড়াবে। আর যদি সে এমন বলে তবে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি মানুষের দুর্বলতা প্রকাশ করে সেগুলো চিহ্নিত করে থাকেন তবে সেটি তাদের সংশোধনের জন্য এবং তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষকে বাঁচাতে এমনটি করেছেন। কিন্তু তিনি (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেন,

'গালিয়াঁ শুনকর দুয়া দেতা হুঁ উন লোগোঁ কো'/ রহম হ্যা জোশ মেঁ অউর গায়েয ঘাটায়া হামনে।'

[তাদের গালমন্দের বিপরীতে আমি তাদের জন্য দোয়া করে থাকি; আমার মাঝে দয়া উদ্বেলিত আর ক্রোধকে আমরা দমন করেছি– অনুবাদক]

আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, অন্যদের কঠোরতাকে ধৈর্য সহকারে বরণ ও সহ্য করো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যার তিনি সম্মুখীন হয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গাড়িতে বসে লাহোরের (কোনো স্থানে) যাচ্ছিলেন। তখন শহরের দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর পাথর মারতে থাকে যা তাঁর গাড়িতে এসে পড়তে থাকে। সেটি ঘোড়ার আবদ্ধ গাড়ি ছিল। কিন্তু তারা যা করছিল (সে কারণে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কপালে চিড়ও ধরেনি। কিছু পাথর জানালা ভেঙে ভেতরেও এসে পড়ত। আর এরই প্রভাব ছিল যে, তাদেরই মধ্য থেকে শত শত মানুষ এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে যেত, অর্থাৎ তাঁর (আ.) যে ধৈর্য ছিল (তার কারণে)। অতএব এই আদর্শই আমাদের আজও প্রদর্শন করতে হবে।

কেউ যদি ব্যক্তিস্বার্থ এবং হৃদয়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, তবে শর্ত হলো, আমাদের ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সাধন। মহানবী (সা.)-এর যুগে বহু লোক তাঁর এবং সাহাবীদের ধৈর্য ও মনোবল দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর বর্তমান যুগেও এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও মানুষ তাঁর ধৈর্য দেখে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৩০-১৪০)

আজও আমরা এমনটি দেখতে পাই। বহু মানুষের চিঠি আমার কাছে এখনও বিভিন্ন দেশ থেকে এসে থাকে যারা কি-না জামা'তের এই আদর্শ দেখেই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জামা'তের সদস্যদের ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান করে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ধৈর্য একান্ত মূল্যবান বস্তু। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণকারী হয়ে থাকে এবং রাগান্বিত হয়ে কথা বলে না তার বক্তব্য তার নিজের হয় না, বরং খোদা তা'আলা তাকে দিয়ে বক্তৃতা করান। জামা'তের সদস্যদের উচিত ধৈর্য অবলম্বন করা এবং বিরোধীদের কঠোরতার বিপরীতে কঠোরতা প্রদর্শন না করা আর গালির বিপরীতে গালি না দেওয়া। যে ব্যক্তি আমাদের অস্বীকারকারী তার জন্য আবশ্যক নয় যে, সে ভদ্রভাবে কথা বলবে। এটা আবশ্যক নয় যে, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করবে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনীতেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ধৈর্যের মতো কোনো জিনিস নেই। কিন্তু ধৈর্যধারণ করা অনেক কঠিন কাজ। আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য করেন যে ধৈর্য অবলম্বন করে।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

অতঃপর জামা'তের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এবং নবাগতদের সমস্যাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে আর ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্যও সেরূপ বিপদাবলী রয়েছে যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন যখন কোনো ব্যক্তি এই জামা'তে প্রবেশ করে তখন নুতন ও সর্বপ্রথম সমস্যা যা দেখা দেয় তাহলো সাথে সাথেই (তার) বন্ধু -বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজন পৃথক হয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরাও তার শত্রু হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম বলাও পছন্দ করে না এবং জানাযা পড়তে চায় না। এরূপ বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি জানি যে, কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তিও থেকে থাকে এবং এরূপ বিপদে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্মরণ রেখো যে, এরূপ বিপদাপদ আশাও আবশ্যক। তোমরা নবী-রসূলদের চেয়ে বেশি সম্মানিত নও। তাদের ওপরও এরূপ কষ্ট ও বিপদাপদ এসেছে আর তা এজন্য আসে যেন খোদা তা'লার প্রতি ঈমান মজবুত হয়। অর্থাৎ ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এসব বিপদাপদ এসে থাকে, এবং যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধনের সুযোগ লাভ হয়। অবিরত দোয়া করতে থাকো। অতএব এটি আবশ্যকীয় যেন তোমরা নবী ও রসূলদের অনুসরণ করো এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করো। তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

সত্য গ্রহণের কারণে যে বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করে সে প্রকৃত বন্ধু নয়, নতুবা তার উচিৎ ছিল তোমার সাথে থাকা। যারা শুধুমাত্র এই কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে ও তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয় যে, তোমরা খোদা তা'আলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তোমাদের উচিত তাদের সাথে দাঙ্গাফাসাদ না করা, বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া করা। শুধু এটিই নয় যে, লড়াই করা যাবে না, বরং তাদের জন্য দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের দান করেছেন। অতএব তিনি কেবল দাঙ্গাফাসাদ করতেই নিষেধ করেন নি, বরং দোয়া করতেও বলেছেন। হৃদয়ে সহানুভূতি লালন করতে বলেছেন যেন তারাও সত্যকে চিনতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা নিজ পবিত্র আদর্শ ও উত্তম আচার-আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছো।

দেখো! আমি তোমাদের বারংবার এই পথনির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার স্থান এড়িয়ে চলো এবং গালি শ্রবণ

করেও ধৈর্যধারণ করো, মন্দের উত্তর পুণ্যের মাধ্যমে দাও। আর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইলে এমন স্থান থেকে তোমাদের সরে যাওয়াই উত্তম।"

কুরআন শরীফের আদেশও তা-ই যে, সেখান থেকে চলে যাও এবং নম্রতার সাথে উত্তর দাও। বহুবার এমন হয় যে, এক ব্যক্তি একান্ত উত্তেজিত হয়ে বিরোধিতা করে আর বিরোধিতায় সেই পথ অবলম্বন করে যা নৈরাজ্যের পথ। এমনভাবে বিরোধিতা করে যার ফলে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যার ফলে শ্রোতাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু যখন বিপরীত দিক থেকে নম্র উত্তর আসে এবং গালির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় না তখন তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়। এটিও সত্য যে, বর্তমান যুগে বহু মানুষ নির্লজ্জ, উপরন্তু অত্যাচারও করে, কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা লজ্জিত হয়। আর তারা নিজেদের কার্য কলাপে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

সাম্প্রতিক খুতবায় আমি বাংলাদেশের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি উদাহরণও দিয়েছিলাম আর তাতে বলেছিলাম যে, আমাদের এক ছেলে যখন দাঙ্গাবাজদের এক ছেলেকে বলেছিল, তুমি কি জানো, তুমি কী করছো আর কার নামে করছো ? তখন সে বুঝতে পারে, ফলে সে (তার হাতের) ইটটি পিছনে ফেলে দেয় বা যে পাথরটি মারার জন্য উঠিয়েছিল তা নীচে ফেলে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, ধৈর্যকে হাতছাড়া কোরো না। ধৈর্য এমন এক অস্ত্র যে, কামান দিয়ে যে কাজ সমাধা হয় না তা-ও ধৈর্যের দ্বারা সম্ভব। ধৈর্যই (মানুষের) হৃদয় জয় করে।

নিশ্চিতভাবে (একথা) মনে রাখবে যে, যখন আমি শুনি, অমুক ব্যক্তি এই জামা'তভুক্ত হয়েও কারো সাথে ঝগড়া করেছে তখন আমার খুব কষ্ট হয়। এই পন্থাটি আমি মোটেই পছন্দ করি না আর মহান আল্লাহ্ও চান না যে, যেই জামা'ত পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় হবে তারা এমন একটি পথ অবলম্বন করবে যা তাকওয়ার পথ নয়। বরং আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দেন যে, কেউ যদি এই জামা'তের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করে তাহলে তার মনে রাখা উচিত, সে এই জামা'তভুক্ত নয়। এটি অনেক বড় সতর্কবার্তা! এটি সবসময় আমাদের মনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, রাগ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এটি হতে পারে যে, আমাকে নোংরা গালি দেওয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে আজেবাজে ও নোংরা গালমন্দ করলে তোমাদের রাগ হয়। অতএব তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি আল্লাহ্র ওপরই ছেড়ে দাও। তোমরা এর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দাও। এসব গালমন্দ শোনার পরও তোমরা ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করো। তোমরা জানো না যে, এসব লোকের কাছ থেকে আমি কত গালি শুনি! প্রায়ই এমনটি ঘটে যে, অশ্রাব্য গালাগালিতে ভরা চিঠিপত্র আসে, গালিপূর্ণ পোষ্টকার্ড প্রেরণ করা হয়। বেয়ারিং চিঠিপত্র আসে যেগুলোর মাশুলও দিতে হয়। [অর্থাৎ, টিকিট না লাগিয়েই চিঠি পাঠিয়ে দেয়। সেসব ডাকটিকেটের টাকাও দিতে হয়, তারপর পড়তে গেলে তাতে থাকে গালমন্দের স্তূপ।] এমন সব অশ্রাব্য গালি থাকে যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কোনো নবীকেও এ ধরনের গালি দেওয়া হয়নি আর আমার মনে হয় না যে, আবু জাহলের মাঝেও এ ধরনের গালমন্দ করার উপাদান ছিল। এসব লোক যে ধরনের গালি দেয় তা হয়ত আবু জাহলও দেয়নি। তবুও এসব কিছু শুনতে হয়। আমি যেহেতু ধৈর্যধারণ করি তাই তোমাদেরও ধৈর্য ধরা উচিত। বৃক্ষের চেয়ে শাখার গুরুত্ব বেশি নয়।"

নিজের ক্ষেত্রে তিনি পরম ধৈর্যধারণ করতেন। যেমন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বলেছিলেন যে, ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি পরম পর্যায়ের ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি যদি কঠোরতা করেন [অর্থাৎ লোকেরা যে বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কঠোর হয়েছেন] তাহলে এটি সংশোধনের জন্য আর এই অধিকার তঁাকে আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। সবার এই অধিকার নেই। আর যেহেতু অধিকার নেই তাই আমরা যদি এমনটি করি তাহলে সংশোধনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তিনি (আ.) বলেন, তারা আর কতদিন গালাগালি করবে। তোমরা দেখবে অবশেষে তারাই ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাদের গালমন্দ, তাদের দুষ্কর্ম এবং ষড়যন্ত্র আমাকে মোটেই ক্লান্ত করতে পারবে না। তাই আমরাও ক্লান্ত হবো না। আমি যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে না হতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গালাগালিতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তাই এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাব? এটি কখনোই হতে পারে না। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো! তাদের গালাগালিতে কার ক্ষতি হয়েছে, তাদের, নাকি আমার? তাদের দল ছোটো হয়েছে আর আমার (দল) বৃদ্ধি পেয়েছে। জামা'ত যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের মধ্যে থেকেই আসছে। এসব গালাগালি যদি কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে দুই লাখের অধিক লোকের জামা'ত কীভাবে সৃষ্টি হলো?"

যে যুগে তিনি এ কথা বলেছেন তখন তিনি (আ.) জামা'তের সদস্য সংখ্যা দুই লাখ বলেছেন। আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে তাঁর (আ.) আগমনবাণী পৌঁছে গেছে এবং জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলো কি কোনো প্র তিক্রিয়া বা শক্তি প্রদর্শনের ফলে হয়েছে? না! বরং এগুলো ত্যাগ, ধৈর্য এবং দোয়ার ফসল ।

সুতরাং এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে ধৈর্য প্রদর্শন করে যেতে হবে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এরা তো তাদের মধ্য থেকেই এসেছে; নাকি অন্য কোনো স্থান থেকে এসেছে? তারা আমার ওপর কুফরি ফতোয়া দিয়েছে, কিন্তু সেই কুফরি ফতোয়ার কী প্রভাব পড়েছে? জামা'ত বৃ দ্ধি পেয়েছে। এই জামা'ত যদি (মানবীয়) পরিকল্পনার অধীনে চালানো হতো তবে অবশ্যই এই ফতোয়ার প্রভাব পড়ত এবং আমার পথে সেই কুফরি ফতোয়া অনেক বড় প্রতিবন্ধক হতো। কিন্তু যে বিষয় খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে সেটিকে পদদলিত করার সাধ্য মানুষের নেই। আমার বিরুদ্ধবাদীরা যেসব ষড়যন্ত্র করে (এর ফলাফল দেখে) ষড়যন্ত্রকারীদের হতাশই হতে হয়। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এসব লোক, যারা আমার বিরোধিতা করে (তাদের অবস্থা হলো) তারা যেন প্রবল বেগে ধেয়ে আসা এক বিশাল নদীর সামনে বাধা দেয়ার জন্য নিজেদের হাত রেখে দেয়, আর চায় যে, তার মাধ্যমে পানি থেমে যাক।

[নদীর মতো প্রবল বেগে বিশাল জলরাশি ধেয়ে আসছে, এর বিপরীতে নিজেদের হাত পেতে রেখে ভাবে, পানি থেমে যাবে! কিন্তু ফলাফল জানাই আছে, সেটি বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়।] এরা এসব গালাগালির মাধ্যমে (এই ধারাকে) থামাতে চায়, কিন্তু স্মরণ রাখবেন, তা কখনোই থামবে না। গালাগালি করা কি ভদ্র মানুষের কাজ? আমার এসব মুসলমানদের কারণে পরিতাপ হয়, এরা কেমন মুসলমান যারা এমন ধৃষ্টতার সাথে মুখ খোলে। [পাকিস্তানে তো তাদের মিছিল থেকে অদ্ভুত সব গালি দেওয়া হতে থাকে।] তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার নামে শপথ করে বলছি, এমন নোংরা গালাগালি তো আমি কখনো কোনো চন্ডাল-চামারকেও দিতে শুনিনি যেমনটা আমি এসব তথাকথিত মুসলমানদের কাছে শুনেছি! এরূপ গালাগালির মাধ্যমে এসব লোক নিজেদের স্বরূপই প্রকাশ করে থাকে। [গালাগালির মাধ্যমে কেবল তাদের নিজেদের অবস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাদের মনমানসিকতা কেমন, তাদের কর্মকাণ্ড কেমন;] এবং (প্র কারান্ত রে) তারা স্বীকার করে নেয় যে, তারা দুষ্কৃতকারী, পাপাচারী লোক। খোদা তা'লা তাদের চোখ খুলে দিন এবং তাদের প্রতি করুনা করুন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এমন গালমন্দকারী লোক যদি সংখ্যায় এক কোটিও হয় তারা খোদা তা'লার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরা মনে করে, কেবল এক পয়সার একটি পোস্টকার্ডই নষ্ট হবে; কিন্তু তারা জানে না, এই আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আমলনামায়ও কালিমা লিপ্ত হবে। [পোস্টকার্ডে লিখে আমাকে গালাগালি দেয়, এর মাধ্যমে নিজের আমলনামায়ও কালিমা লেপন করতে থাকে।] আমি বুঝতে পারি না যে, তাহলে এভাবে গালাগালি কেন করা হয়? শুধু কি এজন্যই যে, আমি বলি, পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ কোরো না এবং মহানবী (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না? আশ্চর্যের বিষয়! কুরআন শরীফে লেখা আছে যে, হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না, কিন্তু তারা মানতেই চায় নাআর এই কুরআন-বিরোধী বিশ্বাসে অনড় থাকার ব্যাপারেই হঠকারিতা দেখায়! আমি যদি না আসতাম এবং খোদা তা'লা একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা না করতেন তবে তারা যা খুশি বলতে পারত, কারণ তাদেরকে জাগানোর ও তাদের অবহিত করার মতো কেউ তাদের মাঝে ছিলনা। কিন্তু এখন যেহেতু খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) 'হাকাম' (অর্থাৎ ন্যায়বিচারক) আখ্যা দিয়েছেন, তাই আমার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর তাদের টুঁ শব্দটিও করার অধিকার ছিল না। তাকওয়ার পন্থা তো এটিই ছিল যে, তারা আমার কথা শুনত ও গভীরভাবে প্রণিধান করত আর অস্বীকার করার জন্য তাড়াহুড়ো না করত।

আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার আগমনের পর তাদের এভাবে মুখ খোলার অধিকার নেই, কারণ আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি এবং 'হাকাম' হিসেবে এসেছি। " (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০৩-২০৬)

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তার সাথে কেউ পাল্লা দিতেই পারে না– সেটির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বনী ইসরাঈল তাকে (তার দাবি করার) সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিয়েছিল। এজন্য জাতির পক্ষ তাকে কোনো দুঃখকষ্ট বা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। হযরত মূসা (আ.)-কে তার জাতির পক্ষ থেকে কোনো দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় নি, বরং তিনি এর সম্মুখীন হয়েছেন ফেরাউনের পক্ষ থেকে। কিন্তু পক্ষান্ত রে মহানবী (সা.) তাঁর নিজের জাতির পক্ষ থেকেও সমস্যা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে মহানবী

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(সা.)-এর সফলতাগুলো কত উচ্চ পর্যায়ের বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা তাঁর উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ও নির্দে শে তবলীগের কাজ শুরু করেন তখন শুরুতেই জাতির লোকদের প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হন। লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইশদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের সবাইকে ডেকে বলেন, আমি তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরা এর উত্তর দাও। অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং সুযোগ পেলেই তোমাদের হত্যা করার জন্য ওতপেতে বসে আছে; তোমরা তা বিশ্বাস করবে? সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বলে, অবশ্যই আমরা এটি মেনে নেব, কেননা আপনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। তারা যখন এই স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! আমি সত্য বলছি, আমি মহান আল্লাহ্‌র রসূল এবং আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছি। এই কথাটুকু বলতেই তারা সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এক দুষ্ট বলে উঠে, تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ অর্থাৎ নাঊযুবিল্লাহ্, তাঁর (সা.) জন্য ধ্বংস কামনা করে কথা বলে। তিনি (আ.) বলেন, পরিতাপ! যে বিষয়টি তাদের পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য ছিল সেটিকেই অপরিণামদর্শী এ জাতি মন্দ মনে করে আর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। এখন এর বিপরীতে মূসার জাতিকে দেখো। বনী ইসরাঈলরা কঠোর হৃদয়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর তবলীগ করতেইতারা তাকে মেনে নেয়। কিন্তু অপরদিকে (একই) জাতি মূসা (আ.)-এর চেয়েও উত্তম সত্তাকে মানতে পারে নি। হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে আরও বলতে গিয়ে তিনি (আ.) উদাহরণ দেন যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নি যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়েও উত্তম নবী ছিলেন, বরং বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফলে মহানবী (সা.)-এর জন্য সমস্যার সূচনা হয়ে যায়। প্রতিদিনই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হতে থাকে আর এ সময়টা এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, ১৩ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। ১৩ বছর কম সময় নয়। এ সময়ে মহানবী (সা.)যে পরিমাণ কষ্ট ভোগ করেন তা বর্ণনা করা সহজ নয়। দুঃখকষ্ট দেয়া র ক্ষেত্রে জাতির পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি করা নি, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যধারণ ও অবিচলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন। একদিকে দুঃখকষ্ট দেয়া হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, ধৈর্য ধরো এবং অবিচল থাকো। এটিই হলো ধৈর্যের প্রকৃত অর্থ। আর বারবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল যে, পূর্ববর্তী নবীরা যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন তদ্রূপ তুমিও ধৈর্যধারণ করো। মহানবী (সা.)ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে এসব কষ্ট সহ্য করেন এবং তবলীগের ক্ষেত্রে শৈথল্য প্র দর্শন করেননিবরং সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। আর বাস্তবতা হলো, মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় ছিল না, কারণ তারা তো নির্দিষ্ট জাতির প্রতি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তাদের দুঃখকষ্টও ততটাই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ছিল অনেক বেশি। কেননা সর্বপ্রথম তাঁর স্বজাতিই তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল এবং কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল, উপরন্তু খ্রিষ্টানরাও শত্রু হয়ে যায়।

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) কেবল আল্লাহ্‌র একজন বান্দা ও রসূল ছিলেন তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, কারণ তারা তো তাকে খোদা বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেন। এটি নিয়মের কথা যে, মানুষ যাকে খোদা বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের উপাস্য জ্ঞান করে তাকে পরিত্যাগ করা এত সহজ বিষয় নয়, বরং তাকে পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। খ্রিষ্টানদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । তাই তারা যখন শুনে যে, মহানবী (সা.) তাদের কল্পিত খোদাকে মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন তখন তারা তাঁর (সা.) প্রাণের শত্রু হয়েযায়। একদিকে স্বজাতি তাঁর শত্রু, কাফেররা শত্রু, প্রতিমা পূজারীরা শত্রু আর অপরদিকে খ্রিষ্টানরাও শত্রু হয়ে যায়। একইভাবে ইহুদিদের মাঝেও শিরকের বহু মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল।এরপর ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মাঝে শিরকের মতবাদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলআর হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করত। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে মানতে প্রস্তুত ছিল না। তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারাও বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। মোটকথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরেক এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা সবাইবিরোধী হয়ে যায়। ইহুদিরা তো হযরত ঈসা (আ.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী বলত। এর বিপরীতে মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেরাই মিথ্যাবাদী হয়েছ (কেননা) তিনি খোদার মনোনীত এক নবী। এছাড়া তাদের বিরোধিতার আরো একটি বড় কারণ হলো তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণেএটি মনে করেছিল যে, খাতামু ল আম্বিয়া বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন, কেননা তওরাতে আল্লাহ্ তা'লার রীতি অনুযায়ী শেষ নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা এমন ভাষায় করা হয়েছে যার ফলে তাদের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে লেখা আছে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে (এক ব্যক্তি আসবেন)। তারা এর অর্থ ধরে নিয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন অথচ এর অর্থ ছিল বনী ইসমাঈল। অতএব তারা যখন মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে যে, তিনি হলেন খাতামুল আম্বিয়া তখন তাদের সকল আশায় গুড়ে বালি হয়ে যায়। আর তওরাতের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর যে অর্থ তারা ধরে নিয়েছিল, (প্রকৃতপক্ষে) সেটিকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের হৃদয়ে আগুন লেগে যায় এবং তারা বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৯৮-২০০)

এক আহমদী কোনো এক গ্রাম থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হয়। আর তার গ্রামে মৌলবিদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে দোয়ার অনুরোধ করে এবং বলে, আমার গ্রামে এক মৌলবি রয়েছে যে মাদ্রাসায় চাকরি করে। সে কট্টর বিরোধী এবং আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। হুযূর দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাকে সেখান থেকে অন্যত্র বদলি করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা শুনে মুচকি হাসেন এবং তাকে এভাবে বুঝান যে, এই জামা'তে যেহেতু যোগ দিয়েছো তাই এই জামা'তের শিক্ষার ওপর আমল করো। যদি কষ্ট না হয় তাহলে পুণ্য কীভাবে লাভ হবে?

মহানবী (সা.) মক্কায় তেরো বছর কষ্ট ভোগ করেছেন। তোমরা সে যুগের কষ্টের ধারণাও করতে পারবে না আরতোমাদেরকে সেই কষ্ট দেয়াও হয়নি, কিন্তু তিনি সাহাবীদেরকে ধৈর্যধারণেরই উপদেশ দিয়েছেন। অবশেষে সকল শত্রু বিনাশ হয়েছে। এমন যুগ আসন্ন যখন তোমরা এ ই দুষ্টলোকদেরও দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, এই পবিত্র জামা'তকে তিনি পৃথিবীতে বিস্তৃতি দান করবেন। এখন তারা তোমাদেরকে সংখ্যালঘু দেখে কষ্ট দেয়, কিন্তু এই জামা'ত যখন সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে।খোদা তা'লা চাইলে তারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিত না এবং দুঃখ-যাতনা প্রদানকারী সৃষ্টিও হতো না, কিন্তু এদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান। কিছুকাল ধৈর্যধারণের পর দেখবে যে, কিছুই নেই। যে ব্যক্তি কষ্ট দেয়, হয় সে তওবা করে অথবা ধ্বংস হয়। অনেক এমন পত্রও আসে যে, পূর্বে আমরা গালি দিতাম আর মনে করতাম এতেই পুণ্য নিহিত, কিন্তু এখন আমরা তওবা করছি এবং বয়আত করছি। ধৈর্যধারণ করাও একটি ইবাদত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধৈর্যধারণকারীরা অগণিত প্রতিদান লাভ করবে, অর্থাৎ তাদেরকে অজস্র ধারায় প্রতিদান দেওয়া হবে। এই প্রতিদান কেবল ধৈর্যশীলদের জন্য। অন্য ইবাদতের জন্য খোদার এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি নেই। এক ব্যক্তি যখন কারো সমর্থনে জীবন অতিবাহিত করে, তার যখন কোনো কষ্ট হয় তখন সমর্থনকারীর আত্মাভিমান জেগে ওঠে আর সে কষ্ট প্রদানকারীকে ধ্বংস করে দেয়। একইভাবে আমাদের জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনপুষ্ট আর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলে ঈমান দৃঢ় হয়। ধৈর্যের ন্যায় আর কিছু নেই। " (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৪-২৩৫)

এরপর এক উপলক্ষ্যে কিছু মানুষ, যারা বয়আতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে এসেছিল, তাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জগৎপূজারীরা উপায় উপকরণের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কখনো তিনি চাইলে নিজ প্রিয়দের কাজ উপকরণ ছাড়াই করে দেন আর কখনো উপকরণের মাধ্যমে করেন। আবার কখনো এমনও হয় যে, বিদ্যমান উপকরণকে তিনি ধ্বংস করে দেন। বস্তুত নিজ কর্মকে পরিশুদ্ধ করো আর সবসময় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করো। উদাসীনতা প্রদর্শন কোরো না। পলায়নপর শিকার যেভাবে সামান্য অলস হলে শিকারীর করায়ত্তে চলে আসে একইভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন ব্যক্তি শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। তওবা করো, তওবাকে সবসময় জীবিত রাখো এবং কখনো মরতে দিও না। তওবা ছাড়া কখনো থাকবে না। সবসময় তরবায় রত থাকো, কেননা যে অঙ্গকে ব্যবহার করা হয় সেটিই কর্মক্ষম থাকে আর যেটিকে ব্যবহার করা হয় না সেটি স্থায়ীভাবে বিকল হয়ে যায়। একইভাবে তওবাকেওসচল রাখো যেন তা অকেজো না হয়ে যায়।

যদি তোমরা সত্যিকার তওবা না করো তাহলে তা সেই বীজের ন্যায় হবে যা পাথরে বপন করা হয়। আর যদি তা সত্যিকার তওবা হয় তাহলে তা সেই বীজের মতো (হবে) যা উন্নত জমিতে বপন করা হয় আর যথাসময় ফল প্রদান করে।

বর্তমানে এই তওবার পথে বহু সমস্যা রয়েছে। সেই নতুন বয়আতকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, এখন এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমাদেরকে অনেক কথা শুনতে হবে। মানুষ অনেক আজেবাজে কথা বলবে যে, তোমরা এক কুষ্ঠরোগী, কাফের ও দাজ্জালের হাতে বয়আত করেছ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালি দিবে। যারা এরূপ করবে তাদের সামনে কখনো উত্তেজনা প্রদর্শন করবে না।

" আমি তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধৈর্যের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

অতএব এ কথাগুলো আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, তাই তাদের জন্য তোমাদের দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও হেদায়েত দিন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশাবলী।

১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন,মুত্তাকি হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথপ্রদর্শক হন।

৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম তৈরী করেন যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্ররেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তার উপর দৃষ্টি রাখবেন।

৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কঠোর পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তেরো ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং সমাজের সেবক।

১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। এর পাশাপাশি দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেওয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,লন্ডন, ৩০ এপ্রিল, ২০১০)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

কাদিয়ানের নুর হাসপাতালে একজন এক্স-রে টেকনিশিয়ান চায়।

* প্রত্যাশীর বয়স অনুর্দ্ধ ৩৭ বছর হতে হবে। * কোন সরকারি কিম্বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে এক্স-রে টেকনিশিয়ান এর কোর্স থাকতে হবে এবং যেটি ,,,,,,,, স্বীকৃত। ৩) ডাক্তারের নির্দেশাবলী পড়ার জন্য ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪) পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকা প্রত্যাশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ৫) সাপ্তাহিক বদর পত্রিকায় প্রকাশিত শেষ বিজ্ঞপ্তির ২ মাসের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিই গ্রহণযোগ্য হবে। ৬) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। ৭) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৮)প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৯)প্রত্যাশীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। * উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র জামাতের সদর/মুবাল্লিগ ইনচার্জ/ জেলা আমীরের প্রত্যায়িত স্বাক্ষর ও মোহর সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ১০) ইন্টারভিউ-এর সময় আসল সনদ গুলি সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

১ম পাতার শেষাংশ.....

এতীমদের সম্পদকে নিজের দায়িত্বভুক্ত করেছেন, যাতে কেউ একথা মনে করে তা আত্মসাৎ না করে যে, আমরা আত্মসাৎ করলে কে জিজ্ঞাসা করবে? তাই বলা হয়েছে, যদি কেউ এমনটি করে, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করব, এটি আমার দায়িত্ব।

৩) এটাও হতে পারে যে, এতীমদের উল্লেখ করে সেই সঙ্গে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যারা এতীম নয়, তবে এতীম তুল্য। যেমন, সেই সব দুর্বল জাতি যারা নিজেদেরকে শক্তিশালী জাতির নিরাপত্তার আশ্রয়ে সঁপে দেয়। অতএব, এতীমদের কথা উল্লেখের পাশাপাশি তাদের অধিকারসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কিছু কিছু জাতি মর্যাদায় এতীমদের ন্যায় হয়ে থাকে আর তাদের অধিকারসমূহ তোমাদের করায়ত্তে চলে আসে। সেই সময় তাদের অধিকারসমূহের তত্ত্বাবধান করা অবশ্যই তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু চিরকালের জন্য তাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে রেখো না। বরং যখন তাদের মধ্যে যোগ্যতা তৈরী হয়ে যায়, তখন তাদের সম্পদ তাদেরকে সঁপে দাও। বিশ্ববাসী যদি এই আদেশ শিরোধার্য করে তবে আজকের যুগে তৈরী হওয়া এই জাতিগত বিদ্বেষের মূলোৎপাটন হবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক সময় একটি শক্তিশালী জাতি দুবর্ল জাতির অধিকার রক্ষার জন্য তার তত্ত্বধানের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অধীনস্ত সেই জাতিকে যোগ্যতা লাভের পর অবিলম্বে তাদের সম্পদের উপর দখল দিয়ে দেওয়া এবং অধীনস্ত জাতিটি সাবালকত্ব অর্জনের পর তার দেশ এবং সম্পদের উপর অধিকার না রাখাই কর্তব্য। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩২)

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বাৎসরিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন-

আজকে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র এই ইজতেমায় প্রথমবার বক্তৃতা দিচ্ছি। যেভাবে আমি জুমআতে বলেছি। জামাতের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি আল মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এই অনুগ্রহ অথবা সেই সময়ে যেহেতু লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তাই লাজনাদেরকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বলা যায় যে, জা'মাতের মহিলাদের প্রতি এটি একটি অনুগ্রহ, আহমদী নারীরে জন্য এমন একটি অঙ্গ সংগঠন করে গেছেন, যাতে করে তারা নিজেদের মেধা বা মননশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে- যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদী মহিলাদের মাঝে রেখেছেন। সেই যোগ্যতা এবং গুণাবলী থেকে তারা নিজেরাও কল্যাণ লাভ করতে পারে আর অন্যদের মাঝেও তা ছড়িয়ে দিতে পারে।

(বর্তমানে পোলন এর এলার্জি অনেক বেশি। আমারও হয়। এজন্য থামতে হয়। আমি যে ভুলটি করেছি, তা হল, খোদ্দামুল আহমদীয়ার খেলাধুলা দেখার জন্য গিয়েছিলাম।) মোটকথা হল আমি বলেছিলাম, যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদী মহিলাদের মাঝে রেখেছেন-তাদের সেই যোগ্যতা এবং গুণাবলী থেকে তারা নিজেরাও উপকৃত হন এবং অন্যদেরও উপকৃত করেন।

পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন যদি নাও থাকত, তারপরও তাদের নিকট জামাতের একটি মাধ্যম ছিল, যেখানে তারা একত্রিত হয়ে সভা এবং আলাপ আলোচনা করতো এবং তাদের নিজ জ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকের অন্যদের উপকৃত করত। এভাবে তাদের নিজেদের মেধা বা মননশীলতার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি তারা অন্যদেরও উপকার করত। যদিও এটি একটি বিশেষ বিষয়- আর প্রজ্ঞাবান ও মর্যাদাশীল লোকেরাই এই সুযোগ পেয়ে থাকে। মোটকথা, আমি মহিলাদের কথা বলেছিলাম, মহিলাদের জন্য কোন ধরণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা অথবা দৈহিকভাবে স্বাস্থ্য ভাল রাখার কোন সুযোগ ছিল না, অথবা বলা যেতে পারে যে, আহমদী মহিলাদের জন্য আহমদী সমাজে এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না।

লাজনাদের অঙ্গ-সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আহমদী নারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই সুযোগ করে দিয়েছেন, যেখানে তারা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও উপকৃত করতে পারেন। আর নিজেদের যোগ্যতা ও গুণাবলীকে আরো বেশি প্রখর করতে পারেন।

সুতরাং এ সুযোগ থেকে লাভবান হোন এবং আপনাদের এই সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আপনারা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দায় পরিণত হোন। আর সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের (মুসলহে মওউদ) জন্যও দোয়া করুন, যাঁর দুরদৃষ্টি জামাতের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদেরকে জামাতের উপকারী সত্তা বানানোর চেষ্টা করেছেন।

এজন্য আল্লাহ্ তা'লার একজন বান্দাকে তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর এর উত্তম পন্থা হল তাঁকে স্মরণ এবং ইবাদতের উত্তম পদ্ধতিহল, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নামাযসমূহ আদায় করা। এতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও নফল নামায আদায়ের কথাও বলা হয়েছে। এই নির্দেশ নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান।

এজন্য আমরা দেখি, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী সাহানীগণ এবং পুণ্যবতী মহিলারা নামাযের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। বরং বর্ণিত আছে, এসব ইবাদতে তাঁরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন অথবা তাদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন। নফল নামায পড়ে সারা রাত অতিবাহিত করতেন, দিনে রোযা রাখতেন, এমনকি তাদের স্বামীদেরকে আঁ হযরত (সা.) এর কাছে এসে নিবেদন করতে হলো,এদের এত ইবাদত করা থেকে বিরত করুন। কেননা স্বামী-সন্তানদের এবং পরিবারেরও কিছু অধিকার আছে যা তাদের দেওয়া উচিত। বর্তমানযুগেও দেখা যায়, ইবাদত সম্পাদনকারী এমন নারী- যাদের ইবাদতের বিশেষ মান ছিল, তারা কখন নামাযকে নষ্ট হতে দেয় নি। নফল আদায়কারীনী ছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে এত যত্নবান ছিল যে, তাদেরকে দেখে ঘড়ির সময় পর্যন্ত মেলানো যেত।

এখন আমি এখানে হযরত আম্মাজান নুসরত জাঁহা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে-ই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁর গর্ভে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তানও দিয়েছিলেন, তাঁরই একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

এক তো হলো, তিনি সাধারণত মহিলাদের তরবিয়তের জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। কখনও কাদিয়ানে আহমদী ঘরে তরবিয়ত ও খিদমতে খালক এর কাজে যেতেন এবং অধিকাংশ সময় এমন হতো, মহিলারা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আসত এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানভান্ডার থেকে

উপকৃত হওয়ার জন্য সমবেত হত, যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সান্নিধ্যে থাকার ফলে, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে হযরত আম্মাজান যদ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।

যাইহোক, সেকালের নামায এবং ইবাদতের কথা বলছিলাম, যে সব মহিলারা তাঁর কাছে আসতেন, তারা বর্ণনা করেন-

যখন আমরা বসে থাকতাম, বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হত। তিনি আমাদের বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। আর আমরা তাঁর উপদেশ শুনে উপকৃত হতাম। ঘটনাক্রমে তখন যদি আযানের ধ্বনি শোনা যেত,তাহলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে আলোচনা বন্ধ করে এই বলে দাঁড়িয়ে যেতেন, এখন নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমি ভেতরে গিয়ে নামায পড়ে আসি, তোমরাও নামায পড়ে নাও। নামায শেষ করে যখন তিনি বাইরে আসতেন, তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কি নামায পড়েছ?

একজন মহিলা এমনই এক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'আমি আমার ছোট বাচ্চাকে সাথে নিয়ে হযরত আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত করতে যাই। রীতি অনুযায়ী তিনি কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন এবং খুবই খুশি হয়ে তিনি বললেনন, তুমি এসেছ! আলোচনা চলাকালীন আযান হয়। তিনি উঠে ভেতরে চলে যান এবং বলেন, আমি নামায পড়ে আসছি। বাচ্চারা তোমরাও নামায পড়ে নাও। সেই মহিলাটি বলেন, আমার সাথে ছোট বাচ্চা থাকায় অনেক সময় যেহেতু ছোট বাচ্চারা পেচ্ছাব করার ফলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়,তাই চিন্তা করলাম বাড়ি গিয়ে নামায পড়ব।

যখন নামায শেষ করে হযরত আম্মাজান আসলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, নামায পড়েছ কি? আমি বললাম, বাচ্চার কারণে অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিল,তাই বাড়ি গিয়ে নামায পড়ব। এতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার প্রবৃত্তিতে যে বাহানা রয়েছে,তা বাচ্চার উপর চাপিয়ে দিও না। বাচ্চা আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার। এটিকে মহান পুরস্কার মনে করো। আর একে তোমার এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে অন্তরায় বানিও না। আল্লাহ্ তা'লা এতে অসন্তুষ্ট হন।

অতএব, এমন মা যারা বাচ্চার ব্যস্ততার কারণে অথবা বাচ্চার কারণে ব্যস্ততার অজুহাত দেখায় এবং নামায সঠিক সময় না পড়া অথবা একেবারেই না পড়ার সুযোগ খোঁকে,তাদের জন্য এটি একটি অমূল্য উপদেশ- এই বাচ্চাদেরকে তো আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার মনে করে আরো অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, এই কারণে পূর্বের তুলনায় বেশি বেশি ইবাদত কর। ইবাদতকে ভুলে যেও না, নতুবা আল্লাহ্ তা'লা এ পুরস্কার তুলে নেওয়ার শক্তি রাখেন।

যদি এটি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অন্তরায় হয়,যদি এ পুরস্কারের কারণে একজন আহমদী মা সেটিকে আমার বিপরীতে শরিক হিসেবে দাঁড় করায়, তাহলে তাকে এ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখবো।

সুতরাং যাকে অজুহাত হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেই বাচ্চাই বড় হয়ে আপনার দুঃখ এবং কষ্টের কারণ হতে পারে। সমাজে আপনার দুর্নামের কারণও হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি ইবাদত করেন, নামায পড়েন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এই ইবাদতের কল্যাণে আপনার সন্তানের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবেন। আপনার উপর অশেষ কৃপা ও আশিস বর্ষণ করবেন, আর অযাচিত সাফল্য দিবেন। এই প্রতিশ্রুতিই আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে দিয়েছেন। যারা বিনয়ের সাথে নামায পড়ে, তাঁর সামনে মাথা নত করে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না,তারাই তাঁর আশিসের উত্তরাধিকারী।

অতএব, নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান হোন, নিজেদের ইবাদতের মানকে উঁচু করুন। একজন মোমেন মুসলমান আহমদী নারীর জন্য এটি মৌলিক নির্দেশ। নতুবা এ যুগের ইমামকে মানার দাবি একেবারেই অনর্থক; কেননা আপনারা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করবেন বলেই বয়আত করেছেন। নিজেদের মধ্যে নেক ও পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে খোদাতা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসেই আপনারা জামাতভুক্ত হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বরং আপনাদের স্বামীর সন্তানের, আপনাদের সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এ বিষয়েরও নিগরানী করতে হবে, আপনার সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, তাদেরকেও খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী বানাতে হবে। তাঁর প্রেম ও ভালবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে। তাদের হৃদয়েও এ বিষয়টি শলাকার মত গেঁথে দিতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ছাড়া আমাদের জীবন ঊষর ভূমির ন্যায়। আর যখনই এ বিষয়টি আপনাদের সন্তানদের ভেতর প্রোথিত করে দিবেন, তখন দেখবেন, আপনাদের বংশধররা স্বয়ং নিজেদের সংশোধন করবে।

আপনাদের এই উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে যে, আমাদের সন্তানরা এ সমাজের প্রভাবে প্রভান্বিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন,আমাদের সন্তানরা যখন স্কুল এবং কলেজে যায়, তখন সেখানকার পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে খোদাকে ভুলে যাবে না। কেননা বর্তমানে এই নামধারী উন্নত-বিশ্বের নতুন প্রজন্ম বস্তুবাদিতার

প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার এবং ধর্মের মাঝে অবক্ষয় সৃষ্টির ফলে সততা হারিয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণত এসব দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে চলে গেছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক,যারা আহমদী বাচ্চা নয়, আহমদী শিশু বা যুবক নয়,খৃষ্টান অথবা অন্যান্য মুসলমানরাও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের ধর্ম শুধু নাম সর্বস্ব। তবে এ সমাজ খোলামেলা হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যদি আপনাদের বাচ্চাদের তরবীয়ত এ পদ্ধতিতে করেন, খোদা তা'লার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে দেন,তাহলে দেখবেন, যেমনটি বলেছি, আপনার এ সমস্ত চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যাবে।

এই নামায খোদার সাথে সম্পর্ক গড়বে আর আপনার সন্তানদের মদ, নেশা, জুয়া, ব্যাভিচার, মিথ্যা এবং চুরি অথবা সব ধরণের মন্দকর্ম থেকে মুক্ত রাখবে। কেননা, এটি খোদা তা'লার ঘোষণা, 'ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার'। অর্থাৎ নিশ্চয় নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। (সূরা আনকাবুত-৪৬) কিন্তু শর্ত হল, আল্লাহ্‌র ইবাদত, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। মানুষকে দেখানোর জন্য যেন না হয় এবং কাঁধের উপর দায়িত্ব পড়ে গেছে, এ বোঝাটি নামাতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি মথা ঠুঁকে নামায শেষ করি- এমনও যেন না হয়। এমন নামাযে কোন কল্যাণ নেই। বরং আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, উদাসীনতা এবং আলস্যের সঙ্গে যারা নামায পড়ে, সেই নামায তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, আমি জিন্ন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। এরা আল্লাহ্‌ তা'লার মর্যাদাকে শুধু উঁচু করার জন্যই ইবাদত করে না, বরং স্বয়ং ঐ ইবাদতকারীর ইহকাল ও পরকালকে সুনিশ্চিত করে।

অতএব, ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষার দায়িত্ব আপনাদেরই হাতে। আপনারা নিজেদের নামাযের সুরক্ষা ক রুন। নিজেদেরকে এক-খোদার ইবাদতকারী বানান। নিজেদের সন্তানদের জন্য সে সব পুণ্য-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদেরকেও পরিচর্যা করুন যে, আল্লাহ্‌ তা'লার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠছে কি-না?

অনেকে বলেন, বিশেষ করে মায়েরা এটি প্রকাশ করে থাকেন, কেননা, তারাই এটি বেশি অনুভব করেন। অধিকাংশ সময়, একটি নির্ধারিত বয়স পার হয়ে যাওয়ার পর এটি বেশি অনুভূত হয়। তখন তারা একথা বলতে থাকে, ১২, ১৩, ১৪ বছর পর্যন্ত আমাদের সন্তানেরা অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ে ভালই ছিল। যুবক বয়সে কি-যে হল বুঝলাম না। জামাত থেকে তারা দূরে সরে গেছে আর সমাজের নোংরামিতে জড়িয়ে পড়েছে।

কতক ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়, তখন এখানকার আইন তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, তখন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং এমন ছেলে এবং মেয়েরা পৃথব বসবাস করতে আরম্ভ করে। মা-বাবার পক্ষ থেকে একথা বলা,বুঝতে পারছি না কেন এমনটি হচ্ছে? এটি ভুল। তারা জানেন, কেন এমনটি হচ্ছে? এজন্য যে মা-বাবারা সন্তানদের সম্মুখে না নিজেদের ইবাদতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, আর না-ই সন্তানদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

এটা ঠিক যে, আল্লাহ্‌ তা'লার ভালবাসাও আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। কিন্তু এর জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন, আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। যদি মা অথবা বাবা তাদের মধ্য থেকে কোন একজন স্বীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তরবীয়তের প্রতি দৃষ্টি না দেয় এবং সন্তানদের জন্য দোয়া না করে,তাহলে সন্তানদের নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অতএব, গাড়ির চাকার মত আপনাদেরকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দু'জনকে একসঙ্গে চলতে হবে। তখনই আপনার সন্তানরা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ছাড়াই তাদের জীবন-চলার-পথ অতিক্রম করতে পারবে এবং নিজেকে সামাজের জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিত্বে পরিণত করার যোগ্য হবে।

কাজেই এই মৌলিক এবং একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রথম থেকেই দৃষ্টি দিন। অতঃপর বাড়ির পরিবেশকে যখন পবিত্র করবেন, তখন আপনি এ চেষ্টাও করবেন যাতে বর্তমান যুগের বৃথা-কার্যকলাপ এবং বিদআতের প্রভাবন আপনার ঘরে না পড়ে। কেননা, এসব বিষয় এমন যা ঐ পবিত্র পরিবর্তনের চেষ্টাকে ঘুন-পোকার মত খেয়ে ফেলে, যেভাবে ঘুনপোকা কাঠ খেয়ে ফেলে। এখানে এ সমাজের (বর্তমানে একে সংস্কৃতিবান সমাজ মনে করা হয়,অথচ এখানকার সবকিছুই সংস্কৃতি নয়।) এসব মানুস, যারা ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত, খুব কৃষ্টিমনা, সংস্কৃতিবান বলে দাবি করে। স্বাধীনতার নামে রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, বাজার ঘাটে অপকর্ম করে বেড়ায়। তাদের পোশাকের অবস্থা না থাকার মতই। এমন উলঙ্গ পোশাক, একেই এরা সংস্কৃতি বলে,তা কয়েক শ' বছর পূর্বে বরং কোন কোন দেশে মাত্র এখন পর্যন্ত সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী, জঙ্গলে বসবাসকারী অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের অধিবাসীরাও এমন কাপড় পরে না। তখন তাদেরকে অভদ্র, বন্য এবং অসামাজিক মানুষ বলা হয়। কিন্তু যখন এরা নিজেরাই এমন আচরণ করে, তখন তা ভদ্র ও শালীন আচরণ হয়ে যায়।

অতএব, এই সামাজ দ্বারা আপনাদের এতটা প্রভাবিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই দেশেও আজ থেকে কিছু দিন পূর্বে অর্থাৎ কয়েক বছর পূর্বে বরং আজও যারা রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তাদের পোশাক-আশাক অত্যন্ত শালীন। তাদের জামার হাতাগুলো লম্বা। তারা যদি ফ্রকও পরিধান করে, তাহলে লম্বা ফ্রক পরিরধান করে। অথবা মেক্সি বা গাউন পরিধান করে। পূর্বে এসব পোশাক সবাই পরিধান করত। আর এখন হাতেগোনা কেউ কেউ পরিধান করে। যেমনটি আমি বলেছি, রাজ পরিবারের সদস্যরা আজও এমন পোশাক পরিধান করেন। উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোক, তিনি যে দেশেরই হোন না কেন, মদ খেয়ে মাতাল হওয়া, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং নগ্ন পোশাক পরিধান করাকে অপছন্দ করে। যদি তারা কোন ধর্ম মানে না। তারা হয় বংশের পরম্পরা অনুযায়ী নিজেরা শালীন পোশাক পরিধান করে থাকে, নয়তো তারা স্বভাবগতভাবেই নগ্ন পোশাক পরিধান করাকে তারা অপছন্দ করে। তোমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এজন্য তোমাদের এমন উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত যা শালীন। একইভাবে, বৃথা কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে রয়েছে, নোংরা ও নগ্ন চলচিত্র, কুরুচিপূর্ণ বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা। এগুলো এই অজুহাতে বাজারে ছাড়া হয় যে, বর্তমান যুগে দৈহিক সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেন এসব মন্দকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। জানি না তারা কি আত্মরক্ষা করে, না-কি করে না। কিন্তু এতটুকু জানি, প্রতিটি রাস্তায়, গলির মুখে লাগানো অনৈতিক-বিজ্ঞাপনগুলো অবশ্যই সমাজকে নোংরা কাজে লিপ্ত করে। যা প্রকৃতসম্মত, তা যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন এমনিতেই জানা যায়। জ্ঞানার্জনের নামে এসব কুকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। এজন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যভিচার করা থেকে বিরত রাখ'।

অতএব, প্রত্যেক মহিলাকে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে নিজের সন্তানদেরকে বোঝানো উচিত। এবং প্রত্যেক তরুণী, যারা মানসিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে, তাদের এই উপলব্ধি থাকা উচিত, এগুলো এমন মন্দকর্ম, যা আরো অধিক নোংরামিতে প্রলুব্ধ করে। সুতরাং, এর থেকে বাঁচতে হবে।

অতএব, প্রত্যেক এমন জিনিষ, যা অন্যায়ভাবে ব্যবহার হয়,সেটাই মন্দ। যেমন, ইন্টারনেটের ব্যাপারে আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি। এটি বর্তমান যুগের আবিষ্কার। আর এ আবিষ্কার সমূহ আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আবিষ্কারের উল্লেখ আছে, ইন্টারনেটও এর মধ্যে একটি। আর টেলিফোনের প্রচলন এর অন্যতম। টেলিভিশনের যে প্রচলন এটিও একটি, যা বর্তমান যুগে প্রকাশনার কাজে লাগানোর কথা। যদি এসব আবিষ্কারের অপব্যবহার হয়, তাহলে এটি মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে। আর এসব মন্দকর্ম করতে আল্লাহ্‌ তা'লা বারণ করেছেন এবং এগুলি এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মোমেনের পরিচয় হল, 'আনিল লাঘভি মুরিজুন' যারা বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। যখন ইন্টারনেটে বন্ধুদের সাথে ভাব বিনিময় করা, এতে অন্যদেরকে নিয়ে উপহাস করা, গোপনীয়তা ফাঁস করা, একে অন্যের বিপক্ষে কাজ করে অথবা মানুষের আত্মীয়তার বন্ধনে ফাঁটল সৃষ্টির কাজ করে। অন্য মহিলার স্বামীর সাথে ইন্টারনেটে বাক্যালাপ করে তার সংসার ধ্বংস করবে, একে অপরের নিন্দা করবে, তখনই এসব কাজ বৃথাকর্ম ও পাপ বলে গণ্য হবে।

বর্তমান যুগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসব করা হয়। এটিও বর্তমানে নতুন একটি রীতি শুরু হয়েছে। গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা এবং 'না-মহরমের' সাথে কথা বলার এটি একটি সহজ পদ্ধতি। খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বলা হয় এসবই তো ছিল। কি কথাইবা বলেছি। কোন বান্ধবী তার বন্ধুকে বান্ধবীর ফোন নম্বর দেওয়া বা এক বন্ধু তার বান্ধবীকে বন্ধুর ফোন নম্বর দেয়, এভাবেই একে অপরের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মোবাইল নম্বর দিলে বা কোন মাধ্যমে একে অপরের নম্বর তাদের কাছে এলে ফোনের মাধ্যমে এসব পাঠানো আরম্ভ করে। ১২, ১৩ ও ১৪ বছরের মেয়েরাও ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এসব আদান প্রদান করে। আর এ বয়সটাই খারাপ হওয়ার বয়স। এর শেষ পরিণতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা বৃথাকর্ম ও পাপের রূপ নেয়। এজন্য আহমদী ছেলে-মেয়েদের নিজেদের পবিত্রতা, সম্মান, বংশ-মর্যাদা রক্ষার খাতিরে এবং নিজেদের জামাতের সদস্য বলে সে দাবি করে বা যার সাথে সে যুক্ত রয়েছে, এর সম্মান রক্ষার্থে এসব মন্দকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আর আহমদী পুরুষরাও আমার কথা শুনছেন, আপনারাও নিজেদেরকে এথেকে বাঁচান।

পোশাকের কথা হচ্ছিল, নগ্ন পোশাক পরিধান করার ফলে লজ্জা-সম্ভ্রমের বালাই উঠে যায়। পিতা-মাতারা বলেন, কোন সমস্যা নেই, এরা তো এখন বাচ্চা। ফ্যাশন করার শখ হয়, করুক না, সমস্যা কি? ঠিক আছে, ফ্যাশন করুন। কিন্তু ফ্যাশন করতে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

গিয়ে যখন পোশাকে নগ্নতা চলে আসে, তখন সেখানে বাধা দেওয়া উচিত। ফ্যাশন করতে বোরকার মত যে কোট পরিধান করা হয় সেটাও যদি এমন আঁটসাট হয়, যা পরিধান করে পুরুষের সামনে যাওয়া অসমীচীন, তাহলে সেই ফ্যাশন নিষেধ। এটি ফ্যাশনের পরিবর্তে নির্লজ্জতার রূপ নিবে। অতঃপর ধীরে ধীরে পর্দা উঠে যাবে। অথচ, ইসলাম লজ্জা-সম্ভম বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

কাজেই, নিজেদের লজ্জা-সম্ভ্রম এবং পর্দার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং এর সীমার মধ্যে থেকে যতটুকু ফ্যাশন করা যায় করুন। ফ্যাশন নিষেধ করা হয় না কিন্তু, ফ্যাশনের একটা সীমা আছে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখুন। ফ্যাশন করতে চাইলে নিজেদের ঘরে এবং মহিলাদের অনুষ্ঠানাদিতে করুন। বাজারে, বাইরে এবং এমন জায়গায়, যেখানে পুরুষদের সামনে যেতে হয়, সেখানে এভাবে ফ্যাশন করা উচিত নয়। এর ফলশ্রুতিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও মন্দকর্মে জড়িয়ে যেতে পারেন এবং পাপ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

ইসলামী পর্দার সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি পড়ুন এবং এর উপর অনুশীলন করুন। এ বিষয়ে আমি এবং পূর্বের খলীফাগণও বিস্তারিতভাবে কয়েকবার বুঝিয়েছেন। এটি বোঝার চেষ্টা করুন, এর উপর আমল করার চেষ্টা করুন। নির্দেশ রয়েছে, মহিলারা পুরুষের সঙ্গে কথা এমনভাবে বলুন, যাতে কোনও ভাবেই কণ্ঠের কোমলতা প্রকাশ না পায়, যেন পুরুষদের হৃদয়ে কখনও কোনোভাবে মন্দ আকাঙ্খা সৃষ্টি না হয়। অতঃপর পুরুষদের সঙ্গে অবাধ চলাফেরা করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। একটি বয়স পার করার পর ছেলে-মেয়েরা তাদের সহপাঠি এবং স্কুলের ছেলে বন্ধুদের সামনেও পর্দা করুন। কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে, পর্দার মধ্যে থেকে কথা বলা উচিত। মেয়েরা নিজেরাও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং পিতা-মাতাও এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। বিশেষ করে, মায়েরা এ বিষয়ে নিগরানী করুন। একটি বয়স পার করার পর মেয়েরা যদি কোন বাড়িতে যায়, তাহলে 'মহরম' আত্মীয়ের সাথে যেন যায়। আর যে ঘরে কোন বান্ধবীর ভাই উপস্থিত রয়েছে, বিশেষ করে সেই সময় ঐ ঘরে যাওয়া উচিত নয়।

এছাড়া বিভিন্ন সময় এমনও হয়, কোন কিছুই বলা হয় না, যার ফলে সহপাঠি ছেলেরা বড় হয়েও ঘরে আসতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, আহমদী সমাজে এমন মন্দকর্ম খুব কমই দেখা যায়। অধিকাংশই এথেকে নিজেদের সুরক্ষা করছে। কিন্তু যদি এদেরকে লাগামহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে মন্দকর্ম বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সমাজে মেয়েরা যদি আনন্দ করতে চায় তাহলে সর্বত্র এর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ। অতঃপর মসজিদের সাথে, নামায-সেন্টারের সাথে কোনও আয়োজন করুন, যেখানে আহমদী মেয়েরা সমবেত হবে এবং নিজেদের মত করে প্রোগ্রাম করবে। যদি শিশুকাল থেকেই মেয়েদের মাথায় এ বিষয়টি গেঁথে দেওয়া যায়, তোমাদের একটি পবিত্রতা রয়েছে। আর এ সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা খুবই বেশি। তোমরা এখন উপলব্ধি করার বয়সে উপনীত হয়েছ, এজন্য তোমরা তোমাদের নিজেদের স্বভাবে পর্দা সৃষ্টি কর যা তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার ও জামাতের সুনামের কারণ হবে। তাহলে আল্লাহ্ তালার কৃপায় ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মেয়ে এই বিষয়কে অনুধাবন করে পুণ্যের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

প্রত্যেক তরুণী ও মহিলা স্মরণ রাখবেন; আপনি বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মেনে ইসলামের শিক্ষার প্রতি আমল করার অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। এই অঙ্গীকারটি হচ্ছে, আমি নিজেকে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র রাখব। আমার এবং অন্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। কোন আঙ্গুল যেন আমাদের দিকে এই ইঙ্গিত করতে না পারে যে, এই মেয়ে একেবারেই দুনিয়াদার, ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে এবং মন্দ আচরণে লিপ্ত। আর প্রত্যেক মহিলাও যদি এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, আমি যুগ ইমামের সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করেছি, আমি নিজের মধ্যে এক পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টি করব এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টি করব। আর এজন্য সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এমন মহিলা এবং এমন তরুণীরা সমাজে এক অনন্য-মর্যাদা লাভ করবে। আর যেভাবে আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এরূপ চেষ্টার পাশাপাশি যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হয়ে তাঁর ইবাদত করবে, তখন ইনশাআল্লাহ্ তা'লার আপনার মধ্যে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি করবেন এবং আপনার সন্তানদের মধ্যেও সেই পবিত্র পরিবর্তন ঘটাবেন। যার ফলে সমাজে আপনার এমন একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আপনার এবং আপনার সন্তানের নাম নেওয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এ মর্যাদা অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন, যা আমাদের ভবিষ্যত-প্রজন্মের পবিত্রতার নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং আমরা যেন সর্বদা যুগ ইমামের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারি।

এক সতর্ক বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে সতর্ক করে বলেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপের ইতি ঘটবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোনও কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি স্বীয় রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হয়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়,মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২)

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। (তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।" (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 15 June, 2023 Issue No.24

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বাড়ির নাম অবশ্যই রাখুন

-হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)

বেশ কিছুকাল পূর্বে কাদিয়ানে একবার এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। তাঁর বাড়ি ছিল দারুর রহমত মহল্লায়। অনেককে তাঁর ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু ২ ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পরেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। কারণ বাড়ির বাইরে তাঁর নাম বা বাড়ির কোন নামফলক ছিল না। এরপর সম্প্রতি আমি এবং হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব এই মহল্লাতেই আর এক ভদ্রলোকের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাই, কিন্তু অনেকক্ষণ পরও বাড়ি খুঁজে পাই নি। অবশেষে আমি ফেরত চলে আসি, কিন্তু হযরত মুফতি সাহেব এভাবে অনেককে জিজ্ঞাসার পর সেই ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে পান। এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি বাড়ির কোন নাম হয় আর তা নাম ফলকে বাড়ির দরজায় লেখা থাকে, তবে ঠিকানা সন্ধানকারী এবং ডাকের চিঠি পৌঁছতে কত সুবিধা হয়। অনেকে সংকোচবশত নিজের বাড়ির নাম রাখে না বা অনেকে ভাল নাম রাখা গর্ব প্রদর্শন করা মনে করে। কিন্তু গর্ব প্রদর্শন নয়, বরং শুভ নিদর্শন হিসেবে ভাল নাম রাখা যায়। নিজের ছেলের নাম নুরুদ্দীন রাখা অহংকার মনে করে না, কিন্তু বাড়ির নাম বায়তুন নুর রাখতে সংকোচ করা সত্যিই অদ্ভুত বিষয়।

এরপর আমি একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আহমদীদের জন্য বাড়ির নাম রাখা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কর্মপন্থা আমাদের জন্য এই কাজটি অনিবার্য করে দিয়েছে। লক্ষ্য করুন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর যখন নিয়মিত ওহী নাযেল হতে শুরু করল, তখন প্রারম্ভিক দিনগুলিতেই তাঁকে তাঁর বাড়ির দুটি অংশের নাম ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়। অর্থাৎ বায়তুল ফিকর এবং বায়তুয যিকর। (বায়তুল ফিকর সেই কক্ষটিকে বলা হয় যা মসজিদ মুবারক সন্নিবিষ্ট আর যেখানে বারাহীনে আহমদীয়া রচিত হয়েছিল। অপরদিকে মসজিদ মুবারকই হল বায়তুল যিকর।) এই ইলহামের মাধ্যমে হুযুর (আ.)-এর কাছে ঐশী অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর হুযুর (আ.) যতবার গৃহ সম্প্রসারণ করেছেন, তাতে তিনি অধিকাংশ অংশের নাম নিজে রেখেছেন। যেমন দারুল বারকাত, বায়তুন নুর, হুজরা, বায়তুদ দোয়া প্রভৃতি তাঁরই দেওয়া নাম। এই রীতির অনুসরণে হযরত আমীরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)ও তাঁর কুঠির নাম রাখেন দারুল হামদ। বস্তুত, আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, বরং ওয়াসসে মাকানাকা' এবং ঐশী অভিপ্রায়ও এটাই। তাই আমি বন্ধুদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যখন কেউ বাড়ি তৈরী করে তখন তার সেভাবেই নাম রাখুন যেভাবে নিজের ছেলেমেয়েদের নাম রাখেন। বিশেষ করে কাদিয়ানের মানুষদের জন্য এই রীতি মেনে চলা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। একথা মনে করা উচিত নয় যে, বাড়ি ছোট বা নগণ্য। দরিদ্র ও তুচ্ছ মানুষের কি নাম হয় না? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বৈঠকখানার চেয়েও আয়তনে ছোট কোন ঘর হতে পারে? হুযুর (আ.) সেই বৈঠকখানারই নাম রেখেছিলেন। বায়তুন নুর। এছাড়া নাম রাখার একটা উপকারিতা হল, ভাল নাম রাখলে যে অন্তর্নিহিত কল্যাণ সুপ্ত থাকে তা লাভ হবে।

সবশেষে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাড়ির নাম যাই হোক তা যেন উপযুক্ত হয় আর কল্যাণময় অর্থবহ হয় অথবা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) প্রস্তাবিত নাম হয়। আর সব থেকে ভাল হয় নাম যদি সংক্ষিপ্ত হয় যাতে মানুষ সহজে উচ্চারণ করতে পারে, অসুবিধে না হয়। আর যদি বাড়ির মালিক বা তার স্ত্রী সন্তানের মধ্য থেকে কারো নামে নাম হয় তবে আরাও ভাল। আর যদি নির্মাণের ইতিহাসও যদি এতে অন্তর্নিহিত থাকে তবে সোনায় সোহাগা।

মাস কয়েক হল, আমাকেও নিজের বাড়ির জন্য কয়েকটা নাম খুঁজতে হয়েছিল। সেই সময় অনেকগুলো নাম আমার মাথায় এসেছিল যা নিম্নে নমুনা হিসেবে লিখে দিচ্ছি যাতে মানুষের উপকার হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যে একবার মাননীয় মিসবাহুদ্দীন সাহেব আমার কাছে এসে বলেন, 'আমি বাড়ি বানিয়েছি যার নাম 'মুহাব্বতে সরায়' রাখতে চাই।' আমি বললাম, আপনার বাড়ির নাম 'যুজাজাতুন' হওয়া উচিত। কেননা কুরআনের আয়াত 'আল মিসবাহু ফি যুজাজাতিন' এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মিসবাহুদ্দীনের সঙ্গে অন্য যে কোনও নামের তুলনায় 'যুজাজাতুন' বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। (মিসবাহ-র অর্থ প্রদীপ আর 'যুজাজাতুন' এর অর্থ কাঁচের ল্যাম্প।) তাই নাম রাখার সময় যদি কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিশেষ শব্দও পাওয়া যায় তবে তা আরও যথাযথ হয়।

এখন আমি সেই নামগুলি লিখে দিচ্ছি।

'আল গুরফা', আল মেহরাব, কাওয়াকিব, আসসাফিনা, আর রাওজা, যিনাত, আন নাজাম, আল ফালাক, আল মাসকান, আত তৈয়্যব, আরযী মঞ্জিল, মিনারা ভিউ, ওয়াসসে মাকানাকা, আহমদী মঞ্জিল, কাশানা, আশিয়ানা, গোশায়ে তানহাই, গোশায়ে আফিয়াত, গুলশান, গুলস্তান,হাদীকা, ফযলে ইলাহি, গরিবখানা, মুহাববাতে সরায়, হাসবিআল্লাহ্, এনামে ইলাহি, ইনায়াতে ইলাহি ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও মঞ্জিল, মহল, দার, বায়ত, খানা, হাউস, বিল্ডিং ইত্যাদি শব্দ মালিকের নাম বা অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাড়ির নাম হতে পারে। যেমন, ফকির মঞ্জিল, নুর মহল, দারুল ফযল, বায়তুয যাফর, খানা দরবেশ, নুর বিল্ডিং ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক নাম রাখতে হলে কোন পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ একাজ করতে পারবে না। মসজিদ মুবারকের সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ইলহাম এমন যা থেকে এর নির্মাণ সাল পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়েছে-

مُبَارَكٌ وَمُبَارِكٌ وَكُلُّ اَمْرٍ مُبَارَكٍ يُّجْعَلُ فِيْهِ

(১৩০০হিজরী) অতএব ঐতিহাসিক নাম রাখাও ঐশী অভিপ্রায় অনুসারেই হয়ে থাকে। এই ঐতিহাসিক নাম হয় স্থায়ী নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা বাড়ির আসল নাম অন্য কিছু হয় আর ঐতিহাসিক অন্য কিছু। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাম উপস্থাপন করছি-

দারুল হামদ হযরত আকদস

'দারুল হামদ হযরত মাহমুদ ইমাম জাহাঁ' (১৯৩২) :

আননুসরত হযরত আমীরুল মোমেনীন (রা.) 'গুলজার মঞ্জুম' " (১৯৩৪)

কোঠি চৌধুরী সাহেব:

"পায়েগাহ যাফরুল্লাহ্ খান' (১৯৩৬)

আস সুফফা:

'সুফফা ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল' (১৩৫৪হিজরী)

পরের সংখ্যায় কয়েকটি আয়াত এবং পঙক্তি লিখব যা বাড়ির নাম ফলকে লেখা যেতে পারে। কেননা, সচরাচর মানুষের এদিকেও আগ্রহ রয়েছে।

(সৌজন্যে: দৈনিক আল ফযল, কাদিয়ান, ২২ শে আগস্ট, ১৯৩৬)

খুতবার শেষাংশ.....

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তা হলো ধৈর্য। তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের মাঝেই আমাদের সাফল্য নিহিত।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হচ্ছে তওবা -ইস্তেগফার। (প্রতিক্রিয়া দেখানো আমাদের বিজয়ের অস্ত্র নয় বরং আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হলো তওবা-ইস্তেগফার,) ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন আর খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বকে দৃষ্টিপটে রাখা এবং পাঁচ বেলার নামাজ আদায় করা।

নামায দোয়া কবুলিয়তের চাবিকাঠি। নামায যখন পড়বে তখন এতে দোয়া করো এবং আলস্য প্রদর্শন করো না। আর প্রত্যেক মন্দ থেকে, তা আল্লাহ্‌র অধিকার সংক্রান্ত হোক বা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত– আত্মরক্ষা করো।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯৮৪

অতএব এগুলো হলো সেসব উপদেশ যা আমাদের সফলতা এবং উন্নতির ভিত্তি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা যদি প্রকৃত অর্থে তওবা-ইস্তেগফার আর ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং পাঁচ বেলার নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকি তাহলেই আমাদের সফলতা আসবে। বিরোধীরা যতটা গোলমাল ও শোরগোলের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে আমাদেরকে ততটাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অধিক বিনত হতে হবে। এটিই আমাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদেরকে এরই নসীহত করেছেন, কোনো প্র কার প্রতিক্রিয়া দেখাতে নয়। আমাদের সফলতা সর্বাবস্থায় নির্ধারিত যেমনটি তিনি বলেছেন, ইনশাআল্লাহ্।

তবে হ্যাঁ, এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্র জ্ঞার সাথে নিজেদের দায়িত্বও আমাদেরকে পালন করে যেতে হবে। প্রজ্ঞা বা হিকমতের ভিত্তিতে অনেক কাজ হতে পারে। তাই প্রজ্ঞা অবলম্বন করে চলা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী যদি নিজের এই দায়িত্বকে উপলব্ধি করে নেয় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান আমাদের আচারআচরণ আর দোয়ার মাধ্যমে হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ধৈর্য এবং দোয়া করার তৌফিক দিন আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এসব বিষয়ের ওপর আমল করার তৌফিকদান করুন। (আমীন)

****

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir